মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আহলেহাদীছ আন্দোলন
কি ও কেন?

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩

হা.ফা.বা. প্রকাশনা-১২

ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

حركة أهل الحديث ما هى ولما هى

تأليف: الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب

الأستاذ (المتقاعد) فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

১ম সংস্করণ

জুলাই ১৯৭৯ খৃ.

৬ষ্ঠ সংস্করণ (হাফাবা)

শাওয়াল ১৪৩৯ হি./আষাঢ় ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/জুলাই ২০১৮ খৃ.

মুদ্রণে

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য

২৫ (পঁচিশ) টাকা মাত্র

Ahl-i-Hadeeth Movement What and Why? (6th Edn.) by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib**. Professor (Rtd) of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph: 88-0247-860861. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

৪র্থ ও ৬ষ্ঠ সংস্করণের ভূমিকা

(مقدمة الناشر للطبعة الرابعة والسادسة)

বিশ্বে যতগুলি ইসলামী আন্দোলন রয়েছে, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং নির্ভেজাল হ'ল 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'। দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করার জন্য ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নামই হ'ল 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'। এ আন্দোলনের লক্ষ্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন। এর ভিত্তি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ। বাংলাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের ক্ষেত্রে অত্র বইখানি ১৯৭৯ সালে ১ম প্রকাশের পর হ'তেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সম্মানিত লেখক বিরাট একটি বিষয়কে সংক্ষেপে ও সাবলীল ভঙ্গিতে এবং সহজ-সরল ভাব ও ভাষার মাধ্যমে জনগণের সম্মুখে তুলে ধরার অসাধ্য সাধন করেছেন। তিনি পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ'** শিরোনামে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানজনক পিএইচ. ডি. (Ph.D) ডিগ্রী লাভ করেছেন। অত্যন্ত তথ্যবহুল ও গবেষণা সমৃদ্ধ এ অভিসন্দর্ভটি 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' ১৯৯৬ সালে গ্রন্থাকারে (৫৪০ পৃ.) প্রকাশ করার গৌরব অর্জন করেছে। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ।*

উল্লেখ্য যে, অত্র বইটি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর উপরে লিখিত মাননীয় লেখকের প্রথম বই। এ বইটি সহ পরবর্তীতে ১৯৯২ সালের নভেম্বরে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা লাভের আগ পর্যন্ত তাঁর লিখিত সকল বই তাঁর নিজ উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। কিছু বই ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা; জমঈয়াতু এহইয়াইত তুরাছিল ইসলামী, কুয়েত; ধর্ম মন্ত্রণালয়, রিয়াদ, সঊদী আরব কর্তৃক প্রকাশিত হয়। পরে সব বই তাঁর অনুমতিক্রমে হা.ফা.বা. থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও সম্মানিত লেখক বইটির ৪র্থ সংস্করণ একবার দেখে দিয়েছেন ও বেশ কিছু তথ্য সংযোজনের কষ্ট স্বীকার করেছেন, সে জন্য তাঁকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। ৪র্থ সংস্করণের ইংরেজী অনুবাদ (৭০ পৃ.) ২০১২ সালে হাফাবা-এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান ৬ষ্ঠ সংস্করণে যৎসামান্য সংশোধনী এসেছে।

বইটির মাধ্যমে বিদগ্ধ পাঠক-পাঠিকাদের নিকটে আহলেহাদীছ আন্দোলন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি হ'লে এবং সাথে সাথে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রতরভাবে অনুভূত হ'লে আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করব। হে আল্লাহ! তুমি মাননীয় লেখক ও তাঁর পরিবারবর্গকে ইহকালে ও পরকালে সর্বোত্তম জাযা দান কর এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট আমাদের সকলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সার্বিক জীবন পরিচালনার তাওফীক দান কর! আমীন!!

প্রকাশক

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه

ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

আহলেহাদীছের পরিচয়

(تعارف أهل الحديث)

ফারসী সম্বন্ধ পদে ‘আহলেহাদীছ’ এবং আরবী সম্বন্ধ পদে ‘আহলুল হাদীছ’-এর আভিধানিক অর্থ : হাদীছের অনুসারী। পারিভাষিক অর্থ : পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী। যিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে নিঃশর্তভাবে মেনে নিবেন এবং রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)* ও ছাহাবায়ে কেরামের তরীকা অনুযায়ী নিজের সার্বিক জীবন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন, কেবলমাত্র তিনিই এ নামে অভিহিত হবেন।

ছাহাবায়ে কেরাম হ’লেন জামা‘আতে আহলেহাদীছের প্রথম সম্মানিত দল, যাঁরা এ নামে অভিহিত হ’তেন। যেমন- (১) প্রখ্যাত ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) (মৃ. ৭৪ হি.) কোন মুসলিম যুবককে দেখলে খুশী হয়ে বলতেন,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى الشَّبَابَ قَالَ: مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُوَسِّعَ لَكُمْ فِي الْمَجْلِسِ وَأَنْ نُفَهِّمَكُمُ الْحَدِيثَ فَإِنَّكُمْ خُلُوْفُنَا وَأَهْلُ الْحَدِيْثِ بَعْدَنَا-

‘রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*-এর অছিয়ত অনুযায়ী আমি তোমাকে ‘মারহাবা’ জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)* আমাদেরকে তোমাদের জন্য মজলিস প্রশস্ত করার ও তোমাদেরকে হাদীছ বুঝাবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। কেননা তোমরাই আমাদের পরবর্তী বংশধর ও পরবর্তী ‘আহলেহাদীছ’।[১]

---

১. বায়হাক্বী, শো‘আবুল ঈমান হা/১৭৪১; আবুবকর আল-খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ (লাহোর : রিপন প্রেস, তারিখ বিহীন), পৃ. ১২; আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮০। তবে বর্ণনাটির فَإِنَّكُمْ خُلُوْفُنَا وَأَهْلُ الْحَدِيْثِ بَعْدَنَا ‘কেননা তোমরাই আমাদের পরবর্তী বংশধর ও পরবর্তী ‘আহলেহাদীছ’- অংশটুকুর দু’জন রাবী ‘খুবই দুর্বল’। কিন্তু মর্ম

(২) খ্যাতনামা তাবেঈ ইমাম শা‘বী (২২-১০৪ হি.) ছাহাবায়ে কেরামের জামা‘আতকে ‘আহলুল হাদীছ’ বলতেন। যেমন একদা তিনি বলেন,

لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا حَدَّثْتُ إِلاَّ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْحَدِيْثِ–

‘এখন যেসব ঘটছে, তা আগে জানলে আমি কোন হাদীছ বর্ণনা করতাম না, কেবল ঐ হাদীছ ব্যতীত, যার উপরে ‘আহলুল হাদীছগণ’ অর্থাৎ ছাহাবীগণ একমত হয়েছেন’।[২]

(৩) ছাহাবায়ে কেরামের শিষ্যমণ্ডলী তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈন সকলে ‘আহলেহাদীছ’ ছিলেন। ইবনু নাদীম (মৃ. ৩৮৪ হি.) তাঁর ‘কিতাবুল ফিহ্‌রিস্ত’ গ্রন্থে, ইমাম খত্বীব বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হি.) স্বীয় ‘তারীখু বাগদাদ’ দ্বাদশ ও চতুর্দশ খণ্ডে এবং ইমাম হেবাতুল্লাহ লালকাঈ (মৃ. ৪১৮ হি.) স্বীয় ‘শারহু উছূলি ই‘তিক্বাদ ...’ গ্রন্থে ছাহাবায়ে কেরাম হ’তে শুরু করে তাঁর যুগ পর্যন্ত তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম ও নেতৃবৃন্দের নামের দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। এতদ্ব্যতীত ‘আহলেহাদীছ-এর মর্যাদা’ শীর্ষক ‘শারফু আছহাবিল হাদীছ’ নামে ইমাম খত্বীব বাগদাদীর একটি পৃথক বইও রয়েছে।

(৪) ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০ হি.), ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হি.), ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হি.), ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হি.) সকলেই ‘আহলেহাদীছ’ ছিলেন। স্বীয় যুগে হাদীছ তেমন সংগৃহীত না হওয়ার কারণে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) অধিকহারে রায় ও ক্বিয়াসের আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে তাঁকে إِمَامُ أَهْلِ الرَّأْىِ বা ‘আহলুর রায়দের ইমাম’ বলা হয়ে থাকে। তিনি নিজে কোন কেতাব লিখে যাননি। বরং শিষ্যদের অছিয়ত করে গিয়েছেন এই বলে যে, إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَـــذْهَبِيْ ‘ইযা ছাহ্‌হাল হাদীছু ফাহুয়া মাযহাবী’ অর্থাৎ ‘যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনে রেখ সেটাই আমার মাযহাব’।[৩]

ছহীহ। কারণ তখন ছাহাবী ও তাবেঈগণই ছিলেন পরবর্তী বংশধর ও পরবর্তী আহলুল হাদীছ *(দ্র. মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী ১৮/১০ সংখ্যা, জুলাই ২০১৫)*।

২. শামসুদ্দীন যাহাবী দামেশক্বী (৬৭৩-৭৪৮ হি.), তাযকেরাতুল হুফফায (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি) ১/৮৩ পৃ.।

৩. মুহাম্মাদ আমীন ইবনু আবেদীন দামেশক্বী (১১৯৮-১২৫২ হি.), রাদ্দুল মুহতার (বৈরূত : দারুল ফিক্‌র ১৩৯৯/১৯৭৯) ১/৬৭ পৃ.; আব্দুল ওয়াহহাব শা‘রানী, মীযানুল কুবরা (দিল্লী : ১২৮৬ হি.) ১/৩০ পৃ.।

(৫) একবার তিনি তাঁর প্রধান শিষ্য আবু ইউসুফ-কে বলেন, لاَ تَرْوِ عَنِّي شَيْئًا فَإِنِّىْ وَاللهِ مَا أَدْرِىْ مُخْطِئٌ أَنَا أَمْ مُـــصِيْبٌ؟ ‘তুমি আমার পক্ষ হ’তে কোন মাসআলা বর্ণনা করো না। আল্লাহ্র কসম! আমি জানি না নিজ সিদ্ধান্তে আমি বেঠিক না সঠিক’।[৪]

(৬) আরেকবার তাঁর বক্তব্য লিখতে দেখে তিনি তাকে ধমক দিয়ে বলেন,

وَيْكَ يَا يَعْقُوْبُ! لاَ تَكْتُبْ كُلَّ مَا تَسْمَعُهُ مِنِّى فَإِنِّي قَدْ أَرَى الرَّأْيَ الْيَـــوْمَ فَأَتْرُكُهُ غَدًا، وَ أَرَى الرَّأْىَ غَدًا وَ أَتْرُكُهُ بَعْدَ غَدٍ–

‘সাবধান হে ইয়াকূব (আবু ইউসুফ)! আমার নিকট থেকে যা-ই শোন, তাই-ই লিখে নিয়ো না। কেননা আমি আজকে যে রায় দেই, কালকে তা পরিত্যাগ করি; কালকে যে রায় দেই, পরদিন তা প্রত্যাহার করি’।[৫]

চার ইমামের সকলেই তাঁদের তাক্বলীদ তথা দ্বীনী বিষয়ে তাদের রায়-এর অন্ধ অনুসরণ বর্জন করে ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করার জন্য সকলকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন।[৬] এ জন্য তাঁরা সবাই নিঃসন্দেহে ‘আহলেহাদীছ’ ছিলেন। কিন্তু তাঁদের অনুসারী মুক্বাল্লিদগণ ইমামদের নির্দেশ উপেক্ষা করে পরবর্তীতে ছহীহ হাদীছ পাওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন অজুহাতে তা এড়িয়ে গেছেন এবং স্ব স্ব মাযহাবী বিদ্বানদের রায় ও তাঁদের রচিত ফিক্বহ ও ফৎওয়াসমূহের অন্ধ অনুসারী হয়েছেন। ফলে প্রকৃত প্রস্তাবে তারা এক ইমামের নামে অসংখ্য আলেমের রায়পন্থী ‘আহলুর রায়’ বনে গেছেন। এ জন্য অনুসারীগণ দায়ী হ’লেও ইমামগণ দায়ী নন। সেকারণ খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আবদুল ওয়াহ্হাব শা‘রানী (৮৯৮-৯৭৩ হি.) বলেন, فَالْإِمَامُ مَعْذُوْرٌ وَ أَتْبَاعُهُ غَيْـــرُ مَعْـــذُورِيْنَ ‘ইমামের ওযর আছে, কিন্তু অনুসারীদের কোন ওযর নেই’।[৭]

৪. আবুবকর আল-খত্বীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ ১৩/৪০২ পৃ.।
৫. প্রাগুক্ত; থিসিস পৃ. ১৭৯, টীকা ৪৮।
৬. আব্দুল ওয়াহহাব শা‘রানী, মীযানুল কুবরা (দিল্লী: ১২৮৬ হি.) ১/৬০।
৭. প্রাগুক্ত ১/৭৩ পৃ.।

Contents

ইমামদের ওযর আছে এজন্য যে, তাঁরা যে অনেক হাদীছ জানতেন না, সেকথা খোলাখুলিভাবে বলে গেছেন ও পরবর্তীতে ছহীহ হাদীছ পেলে তা অনুসরণের জন্য সবাইকে তাকীদ দিয়ে গেছেন। কিন্তু অনুসারীদের কোন ওযর নেই এজন্য যে, তারা ছহীহ হাদীছ পাওয়া সত্ত্বেও তা গ্রহণ করেননি ও তার উপরে আমল করেননি। বরং তাদের মধ্যে এই অন্ধ বিশ্বাস দানা বেঁধে আছে যে, তাদের অনুসরণীয় ইমাম বা পীর সবকিছু জানেন। তাঁর ভুল হবার কোন সম্ভাবনা নেই। এমনকি তাঁর ভুল হ'তে পারে, এমনটি চিন্তা করাও বে-আদবী। সেকারণ তাঁরা যেকোন মূল্যে ইমামের রায় বা মাযহাবী ফৎওয়াকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। এমনকি এজন্য ছহীহ হাদীছকে বাদ দিতে হ'লেও কুছ পরওয়া নেই। তাদের সকল গবেষণা ও তাদের পরিচালিত মাদ্রাসা ও প্রতিষ্ঠান সমূহ মূলতঃ এই উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত।

অথচ ইমাম গাযালী (৪৫০-৫০৫ হি.) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর দুই প্রধান শিষ্য সম্পর্কে স্বীয় 'কিতাবুল মানখূলে' বলেন যে, أَنَّهُمَا خالَفا أَبـا حَنِيفَةَ فِـى ثُلُثَـى مَذهَبِـهِ– 'আবু ইউসুফ (১১৩-১৮২ হি.) ও মুহাম্মাদ (১৩১-১৮৯ হি.) আবু হানীফা (রহঃ)-এর মাযহাবের দুই-তৃতীয়াংশের বিরোধিতা করেছেন'।[৮] এতদ্ব্যতীত চার ইমামের নামে প্রচলিত ফৎওয়াসমূহ ও বিশেষ করে হানাফী ফিক্বহে বর্ণিত ক্বিয়াসী ফৎওয়াসমূহের সবটুকু অথবা অধিকাংশ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নয় বলে শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী সহ বহু বিদ্বান মন্তব্য করেছেন।[৯] শুধু ফিক্বহী বা ব্যবহারিক বিষয়েই নয় বরং উছূলে ফিক্বহ বা ব্যবহারিক আইন সূত্রসমূহেও উক্ত শিষ্যদ্বয় ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর বিরোধিতা করেছেন।[১০] অতএব ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং অন্যান্য ইমামদের যেসব মাযহাব বর্তমানে চালু আছে, তার অধিকাংশ পরবর্তী যুগে দলীয় আলেমদের সৃষ্টি।

---

৮. শরহ বেকায়াহ-এর মুক্বাদ্দামাহ (দিল্লী ছাপা ১৩২৭ হি.) পৃ. ২৮, শেষ লাইন; ঐ, দেউবন্দ ছাপা, তাবি, পৃ. ৮।

৯. শাহ অলিউল্লাহ, 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' (কায়রো: ১৩৫৫ হি.) ১/১৬০; ছালেহ ফুল্লানী, ঈক্বাযু হিমাম পৃ. ৯৯; 'তালবীহ'-এর বরাতে মোল্লা মুঈন সিন্ধী, দিরাসাতুল লাবীব (লাহোর: ১২৮৪ হি.) পৃ. ১৮৩, ২৯০, ২৯১; আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী, নাফে' কাবীর পৃ. ১৩ প্রভৃতি; দ্রঃ থিসিস পৃ. ১৮০, টীকা ৫৯, ৬০।

১০. (فَإِنَّهُمَا يُخَالِفَانِ أُصُوْلَ صَاحِبِهِمَا) সুবকী, 'ত্বাবাক্বাতুশ শাফেঈয়াহ কুবরা' (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, তাবি) ১/২৪৩ পৃ.।

নিরপেক্ষভাবে হাদীছ অনুসরণের কারণে ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬ হি.), ইমাম মুসলিম (২০৪-২৬১ হি.), ইমাম আবু দাঊদ (২০২-২৭৫ হি.), ইমাম তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হি.), ইমাম ইবনু মাজাহ (২০৯-২৭৩ হি.), ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী (১৬১-২৩৪ হি.), ইমাম ইসহাক বিন রাহ্ওয়াইহ (১৬৬-২৩৮ হি.), ইমাম আবুবকর ইবনু আবী শায়বাহ (মৃ. ২৩৫ হি.), ইমাম দারেমী (১৮১-২৫৫ হি.), ইমাম আবু যুর'আ রাযী (মৃ. ২৬৪ হি.), ইমাম ইবনু খুযায়মা (২২৩-৩১১ হি.), ইমাম দারাকুৎনী (৩০৫-৩৮৫ হি.), ইমাম হাকেম (৩২১-৪০৫ হি.), ইমাম বায়হাক্বী (৩৮৪-৪৫৮ হি.), ইমাম মুহিউস সুন্নাহ বাগাভী (৪৩৬-৫১৬ হি.) প্রমুখ হাদীছ শাস্ত্রের জগদ্বিখ্যাত ইমাম ও মুহাদ্দিছগণ এবং তাঁদের শিষ্যবর্গ ও অনুসারীগণ সকলেই 'আহলুল হাদীছ' ছিলেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত (أهل السنة والجماعة) :

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাত এবং ছাহাবী ও তাবেঈগণের জামা'আতের অনুসারীদেরকে 'আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আত' বলা হয়। এই জামা'আতের পরিচয় দিতে গিয়ে স্পেনের বিশ্ববিখ্যাত মনীষী হিজরী পঞ্চম শতকের মুজাদ্দিদ ইমাম আবু মুহাম্মাদ আলী ইবনু হায্ম আন্দালুসী (৩৮৪-৪৫৬ হি.) বলেন,

وَأَهْلُ السُّنَّةِ الَّذِيْنَ نَذْكُرُهُمْ أَهْلَ الْحَقِّ وَمَنْ عَدَاهُمْ فَأَهْلُ الْبَاطِلِ فَإِنَّهُمُ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَكُلُّ مَنْ سَلَكَ نَهْجَهُمْ مِنْ خِيَارِ التَّابِعِيْنَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَهْلُ الْحَدِيْثِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ جِيْلاً فَجِيْلاً إِلَى يَوْمِنَا هذَا وَمَنِ اقْتَدَى بِهِمْ مِنَ الْعَوَامِ فِى شَرْقِ الْأَرْضِ وَغَرْبِهَا رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ-

'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত- যাদেরকে আমরা হকপন্থী ও তাদের বিরোধী পক্ষকে বাতিলপন্থী বলেছি, তাঁরা হ'লেন (ক) ছাহাবায়ে কেরাম (খ) তাঁদের অনুসারী শ্রেষ্ঠ তাবেঈগণ (গ) আহলেহাদীছগণ (ঘ) ফক্বীহদের মধ্যে যারা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন যুগে যুগে আজকের দিন পর্যন্ত এবং (ঙ) প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ঐ সকল 'আম জনসাধারণ, যারা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন। আল্লাহ তাদের উপর রহম করুন![১১]

---

১১. আলী ইবনু হাযম, কিতাবুল ফিছাল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল (বৈরূত: মাকতাবা খাইয়াত্ব ১৩২১/১৯০৩) শহরস্তানীর 'মিলাল' সহ ২/১১৩ পৃ.; কিতাবুল ফিছাল

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম, মুহাদ্দেছীন ও হাদীছপন্থী ফক্বীহগণই কেবল আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা‘আত বা ‘আহলুল হাদীছ’ ছিলেন না, বরং তাঁদের অনুসারী ‘আম জনসাধারণও ‘আহলুল হাদীছ’ নামে সকল যুগে অভিহিত ছিলেন এবং আজও হয়ে থাকেন। আল্লাহ বলেন, وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُوْنَ– ‘আর যাদেরকে আমরা সৃষ্টি করেছি, তাদের মধ্যে (অর্থাৎ মানুষের মধ্যে) একটি দল রয়েছে, যারা সত্য পথে চলে ও সে অনুযায়ী ন্যায়বিচার করে’ *(আ‘রাফ ৭/১৮১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, قَلِيْلٌ مِنْ عِبَادِىَ الشَّكُوْرُ– ‘আমার কৃতজ্ঞ বান্দার সংখ্যা কম’ *(সাবা ৩৪/১৩)*।

এতে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক নবীর উম্মতের মধ্যে হকপন্থী একদল উম্মত চিরদিন ছিলেন, আজও আছেন; যদিও তারা সংখ্যায় কম হবেন। এমনকি কোন কোন নবীকে তার উম্মতের মধ্যে মাত্র একজন ব্যক্তি সত্য বলে বিশ্বাস করেছেন।[১২] কোন কোন নবী উম্মত ছাড়াই ক্বিয়ামতের দিন উঠবেন *(বুখারী হা/৫৭০৫)*। অতঃপর রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)* নিজের উম্মত সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন,

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَالِكَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ–

(লা তাযা-লু ত্ব-য়েফাতুম মিন উম্মাতী য-হিরীনা ‘আলাল হাক্বক্বে, লা ইয়াযুররুহুম মান খাযালাহুম, হাত্তা ইয়া’তিয়া আমরুল্লা-হি ওয়াহুম কাযা-লিক’)

অর্থ : ‘চিরদিন আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল হক-এর উপর বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, এমতাবস্থায় ক্বিয়ামত এসে যাবে, অথচ তারা ঐভাবে থাকবে’।[১৩] অর্থাৎ

(বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ২য় সংস্করণ ১৪২০/১৯৯৯) ১/৩৭১ পৃ. ‘ইসলামী ফের্কাসমূহ’ অধ্যায়।

১২. মুসলিম হা/১৯৬; মিশকাত হা/৫৭৪৪ ‘ফাযায়েল ও শামায়েল’ অধ্যায় ‘নবীকুল শিরোমণি (ছাঃ)-এর মর্যাদা’ অনুচ্ছেদ।

১৩. ছহীহ মুসলিম হা/১৯২০ ‘ইমারত’ অধ্যায় ৩৩, অনুচ্ছেদ ৫৩; অত্র হাদীছের ব্যাখ্যা দ্র. মুসলিম, দেউবন্দ ছাপা শরহ নববী ২/১৪৩ পৃ.; বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৭১ ‘ইল্ম’

নিতান্ত অল্প সংখ্যক হ'লেও ক্বিয়ামত প্রাক্কাল অবধি হকপন্থী দলের অস্তিত্ব থাকবে এবং তাঁরাই হবেন সত্যিকারের বিজয়ী দল। উল্লেখ্য যে, হাদীছে বিজয়ী দল বা ত্ব-য়েফাহ মানছূরাহ বলতে আখেরাতে বিজয়ী দলকে বুঝানো হয়েছে, দুনিয়াবী বিজয় নয়। নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা *('আলাইহিমুস সালাম)* প্রমুখ নবীগণ কেউই দুনিয়াবী দিক দিয়ে বিজয়ী ছিলেন না। তথাপি তাঁরাই ছিলেন প্রকৃত বিজয়ী ও বিশ্ব মানবতার আদর্শ পুরুষ।

এক্ষণে 'হক' কোথায় পাওয়া যাবে? এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا–

'(হে নবী!) তুমি বলে দাও যে, 'হক' তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে আসে। অতঃপর যে চায় সেটা বিশ্বাস করুক, যে চায় সেটা অবিশ্বাস করুক। আমরা সীমালংঘনকারীদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি...' *(কাহ্ফ ১৮/২৯)*।

উক্ত আয়াতের আলোকে আমরা বিশ্বাস করি যে, মানুষের চিন্তাপ্রসূত কোন ইযম, মাযহাব, মতবাদ বা তরীকা কখনই চূড়ান্ত সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। এ সত্য পাওয়া যাবে কেবলমাত্র আল্লাহ প্রেরিত 'অহি'-র মধ্যে, যা সংরক্ষিত আছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছসমূহের মধ্যে। এদিকে ইঙ্গিত করেই ভারতগুরু শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬ হি.) বলেন, فَلَيْسَ لِلْعَقْلِ حُكْمٌ فِى حُسْنِ الْأَشْيَاءِ وَ قُبْحِهَا 'কোন বস্তুর চূড়ান্ত ভাল ও মন্দ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দানের ক্ষমতা 'জ্ঞান'-এর নেই'।[১৪] তাই সবকিছুর বিনিময়ে যারা সার্বিক জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী থাকবেন, রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)*-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কেবল তারাই হবেন উম্মতের 'নাজী' ফের্কা বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল। যারা শুরুতেই জান্নাতী হবেন। যেমন রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)* এরশাদ করেন,

---

অধ্যায় ও হা/৭৩১১-এর ভাষ্য 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অধ্যায়; আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭০-এর আলোচনা।

১৪. শাহ অলিউল্লাহ, আল-'আক্বীদাতুল হাসানাহ (দিল্লী ছাপা: ১৩০৪ হি./১৮৮৪ খৃঃ) পৃ. ৫; থিসিস পৃ. ১১৩ টীকা ১১ (ক)।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِى مَا أَتَى عَلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ ... وَإِنَّ بَنِى إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِى عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِى النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً؛ قَالُوا وَمَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ : مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِى رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَ فِىْ رِوَايَةٍ لِّلْحَاكِمِ فِىْ مُسْتَدْرَكِهِ: مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَ أَصْحَابِىْ، وَحَسَّنَهُمَا الْأَلْبَانِىُّ-

‘বনু ইস্রাঈলদের (ইহূদী-নাছারাদের) যেমন অবস্থা হয়েছিল, আমার উম্মতেরও তেমন অবস্থা হবে, এক জোড়া জুতার পারস্পরিক সামঞ্জস্যের ন্যায়। ... বনু ইস্রাঈলগণ ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল, আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এদের সব দলই জাহান্নামে যাবে একটি দল ব্যতীত। ছাহাবীগণ বললেন, সে দল কোন্টি হে আল্লাহ্র রাসূল? তিনি বললেন, আমি ও আমার ছাহাবীগণ যার উপরে আছি, তার উপরে যে দল থাকবে’। হাকেম-এর বর্ণনায় এসেছে, ‘আমি ও আমার ছাহাবীগণ আজকের দিনে যার উপরে আছি’।[১৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَهِىَ الْجَمَاعَةُ ‘সেটি হ’ল জামা‘আত’।[১৬] উক্ত জামা‘আত বলতে কী বুঝায়, এ সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, اَلْجَمَاعَةُ مَا وَافَقَ الْحَقَّ وَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ ‘হক’-এর অনুসারী দলই হ’ল জামা‘আত, যদিও তুমি একাকী হও’।[১৭] এক্ষণে সেই হকপন্থী জামা‘আত বা ‘নাজী’ ফের্কা কোন্টি, সে বিষয়ে আমরা বিগত ওলামায়ে দ্বীন ও সালাফে ছালেহীনের বক্তব্য শ্রবণ করব।-

---

১৫. হাকেম হা/৪৪৪, ১/১২৯ পৃ., সনদ হাসান; তিরমিযী হা/২৬৪১; ঐ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৪৮; ইবনু কাছীর, আন-নিহাইয়াতু ফিল ফিতান ওয়াল মালাহেম (বৈরূত : ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খৃ.) ১/৩৫ পৃ.; আলবানী, মিশকাত হা/১৭১ ‘ঈমান’ অধ্যায়, ‘কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা’ অনুচ্ছেদ।

১৬. আবুদাঊদ হা/৪৫৯৭; মিশকাত হা/১৭২ ‘ঈমান’ অধ্যায়।

১৭. ইবনু ‘আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব, সনদ ছহীহ, আলবানী মিশকাত হা/১৭৩-এর টীকা-৫ দ্রষ্টব্য।

‘নাজী’ ফের্কা কোন্‌টি?

(الفرقة الناجية ما هى؟)

১. ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর উস্তাদ আলী ইবনুল মাদীনী (১৬১-২৩৪ হি.) বলেন,

هُمْ أَهْلُ الْحَدِيْثِ وَالَّذِيْنَ يَتَعَاهَدُوْنَ مَذَاهِبَ الرَّسُوْلِ وَ يَذُبُّوْنَ عَنِ الْعِلْمِ، وَ لَوْلاَ هُمْ لَمْ نَجِدْ عَنِ الْمُعْتَزِلَةِ وَالرَّافِضَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَأَهْلِ الْإِرْجَاءِ وَالرَّأْىِ شَيْئًا مِّنَ السُّنَنِ، فَقَدْ جَعَلَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ الطَّائِفَةَ الْمَنْصُوْرَةَ حُرَّاسَ الدِّيْنِ وَ صَرَفَ عَنْهُمْ كَيْدَ الْمُعَانِدِيْنَ لِتَمَسُّكِهِمْ بِالشَّرْعِ الْمَتِيْنِ وَاقْتِفَائِهِمْ آثَارَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ ... اُوْلَئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

‘উক্ত দল হ’ল ‘আহলুল হাদীছ জামা‘আত’। যারা রাসূলের বিধানসমূহের হেফাযত করে ও তাঁর ইল্‌ম কুরআন ও হাদীছের পক্ষে প্রতিরোধ করে। যদি তারা না থাকত, তাহ’লে মু‘তাযিলা, রাফেযী (শী‘আ), জাহমিয়া, মুরজিয়া ও আহলুর রায়দের নিকট থেকে আমরা সুন্নাতের কিছুই আশা করতে পারি না। বিশ্বপ্রভু এই বিজয়ী দলকে দ্বীনের পাহারাদার হিসাবে নিযুক্ত করেছেন। আর মযবুত শরী‘আতকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী এবং ছাহাবা ও তাবেঈনের সনিষ্ঠ অনুসারী হবার কারণে তাদেরকে হঠকারীদের চক্রান্তসমূহ হ’তে রক্ষা করেছেন। .. এরাই হ’লেন আল্লাহ্‌র সেনাবাহিনী। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র সেনাবাহিনীই হ’ল সফলকাম’।[১৮]

২. ইয়াযীদ ইবনে হারূণ (১১৮-২১৭ হি.) ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (১৬৪-২৪১হি.) বলেন, إِنْ لَّمْ يَكُوْنُوْا أَصْحَابَ الْحَدِيْثِ فَلاَ أَدْرِىْ مَنْ هُمْ؟ ‘তাঁরা যদি আহলেহাদীছ না হন, তবে আমি জানি না তারা কারা’। ইমাম বুখারীও এবিষয়ে দৃঢ়মত ব্যক্ত করেছেন’।[১৯] ক্বাযী ইয়ায (৪৭৬-৫৪৪ হি.) বলেন, –أَرَادَ أَحْمَدُ أَهْلَ السُّنَّةِ وَمَنْ يَّعْتَقِدُ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ‘ইমাম

---

১৮. শারফ ৫; هُمْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ তিরমিযী হা/২১৯২; মিশকাত হা/৬২৮৩।

১৯. ফাৎহুল বারী ১৩/৩০৬, হা/৭৩১১-এর ব্যাখ্যা; সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২৭০-এর আলোচনা; শারফ ১৫ পৃ.।

আহমাদ (রহঃ) একথা দ্বারা আহলে সুন্নাত এবং যারা আহলুল হাদীছ-এর মাযহাব অনুসরণ করে, তাদেরকে বুঝিয়েছেন'।[২০] ইমাম আহমাদ (রহঃ) আরও বলেন, لَيْسَ قَوْمٌ عِنْدِىْ خَيْراً مِّنْ أَهْلِ الْحَدِيْثِ، لاَ يَعْرِفُوْنَ إِلاَّ الْحَدِيْثَ– 'আহলেহাদীছের চেয়ে উত্তম কোন দল আমার কাছে নেই। তারা হাদীছ ছাড়া অন্য কিছু চেনে না'।[২১]

৩. ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হি.) বলেন,

إِذَا رَأَيْتُ رَجُلاً مِّنْ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ فَكَأَنِّيْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيًّا–

'যখন আমি কোন আহলেহাদীছকে দেখি, তখন আমি যেন রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*-কে জীবন্ত দেখি' *(শারফ ২৬)*।

৪. খ্যাতনামা তাবেঈ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১ হি.) বলেন,

هُمْ عِنْدِىْ أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ... وَ قَالَ : أَثْبَتُ النَّاسِ عَلَى الصِّرَاطِ أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ–

'নাজী দল হ'ল আমার নিকটে আহলেহাদীছ জামা'আত'।... লোকদের মধ্যে তারাই ছিরাতে মুস্তাক্বীম-এর উপর সর্বাপেক্ষা দৃঢ়' *(শারফ ১৫, ৩৩)*।

৫. ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ একদা তাঁর দরবারের সম্মুখে কতিপয় আহলেহাদীছকে দেখে উল্লসিত হয়ে বলেন, مَا عَلَى الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّنْكُمْ 'ভূপৃষ্ঠে আপনাদের চেয়ে উত্তম আর কেউ নেই' *(শারফ ২৮)*।

৬. প্রখ্যাত ফক্বীহ আহমাদ ইবনু সুরাইজ (২৪৯-৩০৬ হি.) বলতেন, أَهْلُ الْحَدِيْثِ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الْفُقَهَاءِ لِاعْتِنَائِهِمْ بِضَبْطِ الْأُصُوْلِ– 'দলীলের উপরে কায়েম থাকার কারণে আহলেহাদীছগণের মর্যাদা ফক্বীহগণের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে'।[২২]

---

২০. ফাৎহুল বারী 'ইলম' অধ্যায় হা/৭১-এর আলোচনা ১/১৯৮ পৃ.।
২১. আবুবকর আল-খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ ২৭ পৃ.।
২২. আব্দুল ওয়াহ্হাব শা'রানী, মীযানুল কুবরা (দিল্লীঃ ১২৮৬ হি.) ১/৬২ পৃ.।

৭. ইমাম আবুদাঊদ (২০২-২৭৫ হি.) বলেন, لَوْلاَ هَذِهِ الْعِصَابَةُ لَانْـــدَرَسَ الْإِسْلاَمُ يَعْنِيْ أَصْحَابَ الْحَدِيْثِ– ‘আহলেহাদীছ জামা‘আত যদি না থাকত, তাহ’লে ইসলাম দুনিয়া থেকে মিটে যেত’ *(শারফ ২৯ পৃ.)*।

৮. ওছমান ইবনু আবী শায়বা (১৬০-২৩৯ হি.) একদা কয়েকজন আহলেহাদীছকে হয়রান অবস্থায় দেখে মন্তব্য করেন, إِنَّ فَاسِقَهُمْ خَيْرٌ مِنْ عَابِدِ غَيْـــرِهِمْ ‘আহলেহাদীছের একজন ফাসিক ব্যক্তি অন্য দলের একজন আবেদের চাইতে উত্তম’ *(শারফ ২৭ পৃ.)*।

৯. খলীফা হারূনুর রশীদ (১৪৯-১৯৩ হি.) বলেন,

طَلَبْتُ أَرْبَعَةً فَوَجَدْتُهَا فِيْ أَرْبَعَةٍ: طَلَبْتُ الْكُفْرَ فَوَجَدْتُّهُ فِـــى الْجَهْمِيَّـــةِ وَ طَلَبْتُ الْكَلاَمَ وَ الشَّغَبَ فَوَجَدْتُّهُ فِى الْمُعْتَزِلَةِ وَطَلَبْتُ الْكِذْبَ فَوَجَدْتُّهُ عِنْدَ الرَّافِضَةِ وَ طَلَبْتُ الْحَقَّ فَوَجَدْتُّهُ مَعَ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ –

‘আমি মুসলমানদের চারটি দলের মধ্যে চারটি বস্তু পেয়েছি : (ক) আমি কুফরী সন্ধান করেছি। অতঃপর তা পেয়েছি ‘জাহমিয়া’ (অদৃষ্টবাদী)-দের মধ্যে (খ) কূটতর্ক ও ঝগড়া পেয়েছি মু‘তাযিলাদের মধ্যে (গ) মিথ্যা খুঁজেছি ও সেটি পেয়েছি ‘রাফেযী’ (শী‘আ)-দের মধ্যে। আর (ঘ) আমি ‘হক’ খুঁজেছি এবং তা পেয়েছি ‘আহলেহাদীছ’দের মধ্যে’ *(শারফ ৩১ পৃ.)*।

১০. ‘বড় পীর’ বলে খ্যাত শায়খ আব্দুল ক্বাদির জীলানী আল-বাগদাদী (৪৭০-৫৬১ হি.) ‘নাজী’ ফের্কা হিসাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের বর্ণনা দেওয়ার পর তাদের বিরুদ্ধে বিদ‘আতীদের ক্রোধ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

إِعْلَمْ أَنَّ لِأَهْلِ الْبِدْعِ عَلاَمَاتٌ يُعْرَفُوْنَ بِهَا، فَعَلاَمَةُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ الْوَقِيْعَةُ فِـــىْ أَهْلِ الْأَثَرِ. وعلامةُ الزَّنادقةِ تسميتُهم أهلَ الأَثَرِ بالْحَشْوِيَة، ويُريدون إبطالَ الآثار. وعلامةُ القَدَريةِ تسميتُهم أهلَ الأثر مُجْبِـــرةً. وعلامـــةُ الْجَهْميـــةِ تسميتُهم أهلَ السنة مُشَبِّهَة. وعلامةُ الرافضةِ تسميتُهم أهلَ الأثر ناصِـــبَةً. وَ كُلُّ ذَلِكَ عَصَبِيَّةٌ وَّغِيَاظٌ لِأَهْلِ السُّنَّةِ، وَلاَ إِسْمَ لَهُم إِلاَّ إِسمٌ وَّاحِدٌ وَ هُوَ

أَصْحَابُ الْحَدِيثِ. ولا يُلْتصَقُ بهم ما لَقَّبهم به أهلُ البِدْعِ، كما لم يُلتصقْ بالنبي –صلى الله عليه وسلم– تَسميةُ كُفارِ مكةَ له ساحرًا وشاعرًا ومجنونًا ومفتونًا وكاهنًا–

'জেনে রাখ যে, বিদ'আতীদের কিছু নিদর্শন রয়েছে, যা দেখে তাদের চেনা যায়। বিদ'আতীদের নিদর্শন হ'ল আহলেহাদীছদের গালি দেওয়া ও বিভিন্ন বাজে নামে তাদেরকে সম্বোধন করা। যিন্দীক্বরা তাদেরকে 'হাশভিয়াহ' (বাজে লোকদের দল) বলে। এর দ্বারা তারা হাদীছকে বাতিল করতে চায়। ক্বাদারিয়ারা তাদেরকে 'জাবরিয়া' (অদৃষ্টবাদী) বলে। জাহমিয়ারা (নির্গূণবাদীরা) তাদেরকে মুশাব্বিহাহ (স্রষ্টাকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যবাদী) বলে। রাফেযী (শী'আরা) তাদেরকে নাছেবাহ (আলী (রাঃ)-এর শত্রু দল) বলে। এগুলি আহলে সুন্নাতের বিরুদ্ধে তাদের দলীয় গোঁড়ামী ও অন্ত র্জ্বালার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কেননা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্য কোন নাম নেই একটি নাম ব্যতীত। আর সেটি হ'ল 'আছহাবুল হাদীছ' (আহলুল হাদীছ)। বিদ'আতীদের এই সব গালি প্রকৃত অর্থে আহলেহাদীছদের জন্য প্রযোজ্য নয়। যেমন মক্কার কাফিরদের জাদুকর, কবি, পাগল, মাথা খারাপ, গায়েবজান্তা প্রভৃতি গালি রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)*-এর জন্য প্রযোজ্য ছিল না'।[২৩]

১১. বিখ্যাত ফক্বীহ আহমাদ ইবনু সিনান আল-ক্বাত্বান বাগদাদী (মৃ. ৩৫৯ হি.) বলেন,

لَيْسَ فِى الدُّنْيَا مُبْتَدِعٌ إِلاَّ وَ هُوَ يَبْغَضُ أَهْلَ الْحَدِيْثِ، فَإِذَا ابْتَدَعَ الرَّجُلُ نَزَعَتْ حَلاَوَةُ الْحَدِيْثِ مِنْ قَلْبِهِ–

'দুনিয়াতে এমন কোন বিদ'আতী নেই, যে আহলেহাদীছের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না। যখন কোন ব্যক্তি বিদ'আত করে, তখন তার হৃদয় থেকে হাদীছের স্বাদ ছিনিয়ে নেওয়া হয়'।[২৪]

---

২৩. আব্দুল ক্বাদির জীলানী, কিতাবুল গুনিয়াহ ওরফে গুনিয়াতুত ত্বালেবীন (মিসর: ১৩৪৬ হি.) ১/৯০ পৃ.; (বৈরূত : ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খৃ.) ১/১৬৬ পৃ. ।

২৪. আব্দুর রহমান ছাবূনী, আক্বীদাতুস সালাফ আছহাবিল হাদীছ (কুয়েত: দারুস সালাফিইয়াহ ১৪০৪ হি.), পৃ. ১০২।

১২. ইমাম আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ দামেশক্বী (৬৬১-৭২৮ হি.) বলেন,

مِنَ الْمَعْلُوْمِ لِكُلِّ مَنْ لَهُ خِبْرَةٌ أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيْثِ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ بَحْثًا عَنْ أَقْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ طَلَبًا لِّعِلْمِهَا وَ أَرْغَبِ النَّاسِ فِى اتِّبَاعِهَا وَ أَبْعَدِ النَّاسِ عَنِ اتِّبَاعِ هَوًى يُخَالِفُهَا ... فَهُمْ فِىْ أَهْلِ الْإِسْلاَمِ كَأَهْلِ الْإِسْلاَمِ فِىْ أَهْلِ الْمِلَلِ-

‘যার কিছুটা অভিজ্ঞতা রয়েছে, তার এটা জানা কথা যে, আহলেহাদীছগণ হ’লেন, মুসলমানদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*-এর বাণীসমূহের ও তাঁর ইল্‌মের অধিক সন্ধানী ও সে সবের অনুসরণের প্রতি অধিক আগ্রহশীল। তারা প্রবৃত্তির অনুসরণ হ’তে সর্বাধিক দূরে অবস্থানকারী, যার বিরোধিতা সে করে থাকে।... মুসলমানদের মধ্যে তাদের অবস্থান এমন মর্যাদাপূর্ণ, যেমন সকল জাতির মধ্যে মুসলমানদের অবস্থান’।[২৫]

১৩. ছহীহ মুসলিম-এর শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু শারফ নববী আশ-শামী (৬৩১-৬৭৬ হি.) বলেন, ‘এই ফের্কা মুমিনদের মধ্যকার মুজাহিদ, ফক্বীহ, মুহাদ্দিছ, যাহিদ (দুনিয়াত্যাগী আবেদ), নেকীর কাজের আদেশ দানকারী ও অন্যায় কাজের নিষেধকারী বিভিন্ন পর্যায়ের মুমিন হ’তে পারেন। যারা আল্লাহ্‌র বিধানকে প্রতিষ্ঠা দান করে থাকেন। এদের সবাইকে একস্থানে মওজূদ থাকা আবশ্যিক নয়। বরং তাঁরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকতে পারেন’।[২৬]

১৪. হাফেয ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবনু কাছীর দামেশক্বী (৭০১-৭৭৪ হি.) يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَـــامِهِمْ ‘যেদিন আমরা ডাকব প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতা সহ’ *(ইসরা ১৭/৭১)* আয়াতের ব্যাখ্যায় স্বীয় জগদ্বিখ্যাত তাফসীরে একজন বিগত মনীষীর উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন, هَذَا أَكْبَرُ شَرَفٍ لِأَصْحَابِ الْحَدِيْثِ لِأَنَّ إِمَامَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ‘আহলেহাদীছদের

২৫. আহমাদ ইবনু তাইমিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি) ২/১৭৯ পৃ.।

২৬. মুসলিম শরহ নববী (দেউবন্দ ছাপা) ২/১৪৩ পৃ.; ফাৎহুল বারী ১/১৯৮ হা/৭১-এর ব্যাখ্যা, ‘ইল্‌ম’ অধ্যায়।

জন্য এটাই সবচেয়ে বড় মর্যাদা যে, তাদের একমাত্র ইমাম হ'লেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*'।[২৭]

নিঃসন্দেহে এই উচ্চ মর্যাদা ক্বিয়ামতের দিন কেবল তাদের জন্যই হবে, যারা দুনিয়াবী জীবনে সকল দিক ও বিভাগে যেকোন মূল্যে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপরে কায়েম থেকেছেন এবং অন্য কোন মতবাদ বা রায়-ক্বিয়াসকে অগ্রাধিকার দেননি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ছাহাবী ও তাবেঈদের দেওয়া উপাধিধন্য সত্যিকারের 'আহলেহাদীছ' হওয়ার তাওফীক দান কর ও আমাদেরকে তাদের দলভুক্ত করে নাও- আমীন!!

আহলেহাদীছের বাহ্যিক নিদর্শন

(شعار أهل الحديث)

আহলেহাদীছদের বাহ্যিক নিদর্শন বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম আব্দুর রহমান ছাবূনী দামেশক্বী (৩৭২-৪৪৯ হি.) বলেন, (১) কম হউক বেশী হউক তারা সকল প্রকার মাদকদ্রব্য ব্যবহার হ'তে বিরত থাকেন (২) ফরয ছালাতসমূহ আউয়াল ওয়াক্তে আদায়ের জন্য তারা সদা ব্যস্ত থাকেন (৩) ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করাকে তারা ওয়াজিব মনে করেন (৪) ছালাতের মধ্যে রুকূ-সুজূদ, ক্বিয়াম-কু'ঊদ ইত্যাদি আরকানকে ধীরে-সুস্থে আদায় করাকে তারা অপরিহার্য বলেন এবং এটা ব্যতীত ছালাত শুদ্ধ হয় না বলে মনে করেন (৫) তারা সকল কাজে নবী *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)*, ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের কঠোর অনুসারী হয়ে থাকেন (৬) বিদ'আতীদেরকে তারা ঘৃণা করেন। তারা বিদ'আতীদের সঙ্গে উঠাবসা করেন না বা তাদের সঙ্গে দ্বীনের ব্যাপারে অহেতুক ঝগড়া করেন না। তাদের থেকে সর্বদা কান বন্ধ রাখেন। যাতে তাদের বাতিল যুক্তিসমূহ অন্তরে ধোঁকা সৃষ্টি করতে না পারে'।[২৮]

আমরা বলি, আহলেহাদীছের সর্বাপেক্ষা বড় নিদর্শন হ'ল এই যে, তারা হ'লেন আক্বীদার ক্ষেত্রে শিরকের বিরুদ্ধে আপোষহীন তাওহীদবাদী এবং আমলের ক্ষেত্রে বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীনভাবে সুন্নাতপন্থী। আর

২৭. ইবনু কাছীর, তাফসীর (বৈরূত: ১৪০৮/১৯৮৮) সূরা বনু ইস্রাঈল ৭১ আয়াতের ব্যাখ্যা, ৩/৫৬ পৃ.।

২৮. আব্দুর রহমান ছাবূনী, আক্বীদাতুস সালাফ আছহাবিল হাদীছ পৃ. ৯৯-১০০।

এখানে বলা আবশ্যক যে, আহলেহাদীছ হওয়ার জন্য যেমন আহলেহাদীছ পিতা-মাতার সন্তান হওয়া শর্ত নয়। তেমনি রক্ত, বর্ণ, ভাষা বা অঞ্চলেরও কোন শর্ত নেই। বরং যেকোন মুসলমান নিঃশর্তভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্ত মেনে নিলে ও সেই অনুযায়ী নিজের সার্বিক জীবন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হ'লেই কেবল তিনি 'আহলেহাদীছ' নামে অভিহিত হবেন। নিঃসন্দেহে আহলেহাদীছ-এর প্রকৃত পরিচয় তার নির্ভেজাল আক্বীদা ও আমলের মধ্যে নিহিত। তার পিতৃ পরিচয়, বিদ্যা-বুদ্ধি, অর্থ-বিত্ত বা সামাজিক পদ মর্যাদার মধ্যে নয়।

আহলুল হাদীছ ও আহলুর রায়

(أهل الحديث وأهل الرأى)

'আহলুল হাদীছ' অর্থ হাদীছের অনুসারী। 'আহলুর রায়' অর্থ রায়-এর অনুসারী। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে যারা জীবন সমস্যার সমাধান তালাশ করেন, তাদেরকে 'আহলুল হাদীছ' বলা হয়। পক্ষান্তরে পূর্বসূরী কোন বিদ্বানের রচিত কোন ফিক্বহী উছূল বা ব্যবহারিক আইন সূত্রের ভিত্তিতে যারা জীবন সমস্যার সমাধান নেন, শাহ অলিউল্লাহ (রহঃ)-এর ভাষায় তাদেরকে 'আহলুর রায়' বলা হয়। আহলুর রায়গণ উদ্ভূত কোন সমস্যার সমাধান রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ ও ছাহাবায়ে কেরামের 'আছারে'র মধ্যে তালাশ না করে পূর্ব যুগের কোন মুজতাহিদ ফক্বীহের গৃহীত কোন ফিক্বহী সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেন। অথবা কোন ফিক্বহী মূলনীতির সাথে সাদৃশ্য বিধানের চেষ্টা করেন। অতঃপর তার উপরে ক্বিয়াস বা উপমান পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা বের করে থাকেন।[২৯] এভাবে প্রায় সকল বিষয়ে তারা তাদের অনুসরণীয় ইমাম বা ফক্বীহ-এর কল্পিত 'উছূলে ফিক্বহ' বা ব্যবহারিক আইনসূত্র সমূহের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। ফলে অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা ছহীহ হাদীছের ঊর্ধ্বে ব্যক্তির রায়কে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন।

পক্ষান্তরে আহলুল হাদীছগণ সর্বাবস্থায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে সবার ঊর্ধ্বে স্থান দেন এবং যে কোন ব্যক্তির হাদীছ বিরোধী

---

২৯. শাহ অলিউল্লাহ, 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' (কায়রো: ১৩২২ হি.)১/১২৯ পৃ.; বিস্তারিত জানার জন্য 'আহলুল হাদীছ ও আহলুর রায়-এর পার্থক্য' শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব: ঐ, ১১৮-১২২।

রায়কে প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁরা রায়-এর ভিত্তিতে কুরআন-হাদীছ যাচাই করেন না। বরং কুরআন ও হাদীছের ভিত্তিতে রায়কে যাচাই করেন। তাঁরা 'অহি'-কে 'রায়' বা লৌকিক জ্ঞান-এর উপরে স্থান দেন এবং 'রায়'-কে 'অহি'-র ব্যাখ্যাকারী বলে মনে করেন। কুরআন বা ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্ত নিজের বা নিজের অনুসরণীয় কোন ব্যক্তির রায় বা আইনসূত্রের পরিপন্থী হ'লে তাঁরা বিভিন্ন অজুহাতে হাদীছ প্রত্যাখ্যান করেন না; বরং হাদীছের সিদ্ধান্তকে মাথা পেতে গ্রহণ করেন। আহলেহাদীছগণ 'ইজতিহাদে' বিশ্বাসী এবং তা সকল যুগের সকল যোগ্য আলেমের জন্য উন্মুক্ত বলে মনে করেন। তাঁরা ঐ ধরনের ইজতিহাদ বা রায় ও ক্বিয়াসে বিশ্বাসী, যা পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও ইজমায়ে ছাহাবার উপরে ভিত্তিশীল।

এ কারণে ইমাম মালেক, শাফেঈ, আহমাদ, ইসহাক, ইমাম বুখারী প্রমুখ উম্মতের সেরা ফক্বীহ ও মুজতাহিগণকে 'আহলুর রায়' না বলে বরং 'আহলুল হাদীছ' বলা হয়। পক্ষান্তরে হাদীছের সংগ্রহ কম থাকার কারণে নিজের রায় ও ক্বিয়াসের উপরে অধিক নির্ভরশীল হওয়ার ফলে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-কে 'আহলুর রায়দের ইমাম' বলা হয়ে থাকে। যেমন মরক্কোর জগদ্বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী আব্দুর রহমান ইবনু খলদূন (৭৩২-৮০২ হি.) বলেন,

وَانْقَسَمَ الْفِقْهُ فِيْهِمْ إِلَى طَرِيْقَتَيْنِ، طَرِيْقَةُ أَهْلِ الرَّأْىِ وَالْقِيَاسِ وَ هُمْ أَهْلُ الْعِرَاقِ وَ طَرِيْقَةُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ وَ هُمْ أَهْلُ الْحِجَازِ وَ كَانَ الْحَدِيْثُ قَلِيْلاً فِىْ أَهْلِ الْعِرَاقِ... فَاسْتَكْثَرُوْا مِنَ الْقِيَاسِ وَ مَهَرُوْا فِيْهِ، فَلِذَالِكَ قِيْلَ أَهْلُ الرَّأْىِ وَ مُقَدَّمُ جَمَاعَتِهِمُ الَّذِىْ اسْتَقَرَّ الْمَذْهَبُ فِيْهِ وَ فِىْ أَصْحَابِهِ أَبُوْ حَنِيْفَةَ –

'*(আহলেসুন্নাত বিদ্বানগণের মধ্যেও যুক্তিবাদের ঢেউ লাগে)* ফলে তাদের মধ্যে ফিক্বহ শাস্ত্র 'আহলুল হাদীছ' ও 'আহলুর রায়' নামে দু'টি প্রধান ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। একটি হ'ল, রায় ও ক্বিয়াসপন্থীদের তরীকা। তারা হ'লেন ইরাকের অধিবাসী। দ্বিতীয়টি হ'ল, হাদীছপন্থীদের বা আহলুল হাদীছদের তরীকা। তারা হ'লেন হেজাযের (মক্কা-মদীনার) অধিবাসী। ইরাকীদের মধ্যে হাদীছ খুবই কম ছিল।... ফলে তারা ক্বিয়াস বেশী করেন ও এতে দক্ষতা অর্জন করেন। আর একারণেই তারা 'আহলুর রায়' বা

রায়পন্থী নামে অভিহিত হয়েছেন। এই দলের নেতা ছিলেন আবু হানীফা, যাঁর নামে একটি মাযহাব প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে'।[৩০]

উল্লেখ্য যে, ইরাকেই সর্বপ্রথম হাদীছ জাল করা শুরু হয়। এদিকে ইঙ্গিত করেই ইমাম ইবনু শিহাব যুহরী (৫০-১২৪ হি.) বলেন, 'আমাদের এখান থেকে এক বিঘত পরিমাণ একটি হাদীছ বের হয়ে ইরাক থেকে এক হাত পরিমাণ লম্বা হয়ে ফিরে আসে'। ইমাম মালেক ইরাককে 'হাদীছ ভাঙ্গানোর কারখানা' (دَارُ الــضَّرْبِ) নামে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ একটি ছহীহ হাদীছের মধ্যে অসংখ্য যোগ-বিয়োগ করে তাকে ভাঙ্গিয়ে প্রচার করা হয়।[৩১] ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ছিলেন, ইরাকের কুফা নগরীর অধিবাসী এবং তাঁর প্রধান শিষ্যগণ ছিলেন সেখানকার। এজন্য তাঁর অনুসারীদেরকে হানাফী, কূফী, আহলুর রায়, আহলুল কূফা, আহলুল ইরাক ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

তাক্বলীদে শাখ্‌ছী (التقليد الشخصى) :

তাক্বলীদ (اَلتَّقْلِيْــدُ) 'ক্বালাদাহ' (القَــلاَدَةُ) মাদ্দাহ হ'তে গৃহীত। যার অর্থ 'গলাবন্ধ'। তাক্বলীদ-এর আভিধানিক অর্থ : গলায় রশি বাঁধা। পারিভাষিক অর্থ : قُبولُ قَولِ الْغَيرِ مِن غَيرِ دَلِيلٍ 'শারঈ বিষয়ে কারু কোন কথা বিনা দলীলে মেনে নেওয়া'। পক্ষান্তরে 'ইত্তেবা'র আভিধানিক অর্থ : পদাংক অনুসরণ করা। পারিভাষিক অর্থ : قُبولُ قَولِ الْغَيرِ مَعَ دَلِيــلٍ 'শারঈ বিষয়ে কারু কোন কথা দলীল সহ মেনে নেওয়া'। তাক্বলীদ হ'ল রায়-এর অনুরসণ এবং ইত্তেবা হ'ল দলীলের অনুসরণ। অতএব কোন আলেমের ছহীহ দলীল ভিত্তিক কোন কথাকে মেনে নেওয়ার নাম 'তাক্বলীদ' নয়, বরং তা হ'ল 'ইত্তেবা'। অর্থাৎ দলীলের অনুসরণ। ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযামের যুগে তাক্বলীদের কোন নামগন্ধ ছিল না। অথচ তাঁদের দলীল ভিত্তিক কথার অনুসরণকে অনেকে 'তাক্বলীদ' বলে ভুল বুঝিয়ে থাকেন।

---

৩০. আব্দুর রহমান ইবনু খালদূন, তারীখ (বৈরূত : মুওয়াস্‌সাসাতুল আ'লামী, তাবি), মুক্বাদ্দামা ১/৪৪৬ পৃ.।

৩১. ড. মুছতফা সাবাঈ, আস-সুন্নাহ (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৪র্থ সংস্করণ ১৪০৫/১৯৮৫) ৭৯ পৃ.।

আহলেহাদীছ আন্দোলন ও অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হ'ল 'তাক্বলীদে শাখ্ছী' বা অন্ধ ব্যক্তিপূজা। ২য় শতাব্দী হিজরীর পরে প্রচলিত তাক্বলীদের আবির্ভাব ঘটে। অতঃপর ৪র্থ শতাব্দী হিজরীতে বিভিন্ন ইমামের নামে বিভিন্ন তাক্বলীদী মাযহাবের প্রচলন হয়। শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) বলেন, إِعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا قَبْلَ الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ غَيْرَ مُجْمَعِينَ عَلَى التَّقْلِيدِ الْخَالِصِ لِمَذْهَبٍ وَّاحِدٍ بِعَيْنِـــهِ– 'জেনে রাখ হে পাঠক! ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বে কোন মুসলমান নির্দিষ্টভাবে কোন একজন বিদ্বানের মাযহাবের তাক্বলীদের উপরে সংঘবদ্ধ ছিল না'। .. কোন সমস্যা সৃষ্টি হ'লে লোকেরা যেকোন আলেমের নিকট থেকে ফৎওয়া জেনে নিত। এ ব্যাপারে কারু মাযহাব যাচাই করা হ'ত না।[৩২]

হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হি.) তৃতীয় শতাব্দী হিজরীর শেষদিকের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'এই সময় 'আহলুর রায়' (হানাফী) ফক্বীহদের নেতৃস্থানীয় অনেক আলেম, মু'তাযিলা, শী'আ ও কালাম শাস্ত্রবিদ (দার্শনিক) গণের স্তম্ভ বিশেষ বহু পণ্ডিত বর্তমান ছিলেন। যারা যুক্তিবাদের উপরে ভিত্তি করে চলতেন এবং নবীর হাদীছকে কঠিনভাবে আঁকড়ে থাকায় সালাফে ছালেহীনের তরীকা এড়িয়ে চলতেন। এই সময় ফক্বীহদের মধ্যে তাক্বলীদ আত্মপ্রকাশ করে ও ইজতিহাদের অবক্ষয় শুরু হয়'।[৩৩]

ইমাম গাযালী (৪৫০-৫০৫ হি.) বলেন, 'খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ শেষ হবার পরে ইসলামী খেলাফত এমন সব লোকদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে, যারা শারঈ বিধান সমূহে ছিলেন অনভিজ্ঞ। ফলে তারা সকল বিষয়ে ফক্বীহদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন এবং তাদেরকে বিভিন্ন সরকারী পদে তলব করা হ'তে থাকে। তখন লোকেরা ইল্ম শিখতে লাগল সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভের মাধ্যম হিসাবে। অথচ অন্য আলেমগণ পূর্বেকার স্বচ্ছ রীতির উপরে দৃঢ় থাকেন। তাদেরকে ডাকা হ'লে তারা পালিয়ে যেতেন। এসময় মুসলিম পণ্ডিতগণের কেউ কেউ কালাম শাস্ত্রের উপরে গ্রন্থ রচনা

৩২. শাহ অলিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/১৫২-৫৩ পৃ. 'চতুর্থ শতাব্দী ও তার পরের লোকদের অবস্থা বর্ণনা' অনুচ্ছেদ।

৩৩. যাহাবী, তাযকেরাতুল হুফফায (বৈরূত : তাবি) ২/২৬৭ পৃ.।

শুরু করেন। সেখানে বহু কূটতর্কের অবতারণা করা হয়। এই সময় শাসকগণ হানাফী ও শাফেঈ ফিক্বহের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের উদ্দেশ্যে বিতর্ক অনুষ্ঠানের প্রতি আগ্রহী হ'লেন। ফলে আলেমগণ উক্ত দুই মাযহাবের মধ্যকার বিতর্কিত বিষয়সমূহের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিসমূহের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েন এবং বহু ঝগড়া ও অসংখ্য বই-পুস্তকাদি প্রণয়ন করেন। এভাবে স্ব স্ব মাযহাবের পক্ষে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তাৎপর্যসমূহ উদ্ধার করাকেই তারা তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হিসাবে গণ্য করেন। এই অবস্থা এখনও চলছে। আমরা জানিনা ভবিষ্যতের লিখন কী আছে? *(সংক্ষেপায়িত)*।[৩৪] অর্থাৎ তৎকালীন শাসনামলে 'বিভক্ত কর ও শাসন কর' মন্দ রীতির অনুসরণে হানাফী-শাফেঈ দ্বন্দ্ব উসকে দিতেন। এখন সেই শাসক নেই, শাসনও নেই। কিন্তু মাযহাবের নামে দলাদলি রয়েছে। এমনকি চার মাযহাবকে ফরয বলা হচ্ছে।

শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী বলেন, 'সালাফে ছালেহীন যে রায়-এর নিন্দা করেছেন এবং যেদিকে তাদের অনেক ফক্বীহকে সম্বন্ধ করা হয়েছে, তার তাৎপর্য আমার নিকট উদ্ঘাটিত হয়েছে। আর তা হ'ল '(হে পাঠক!) বিশেষ করে বর্তমান সময়ে বিশ্বের প্রায় সকল অঞ্চলে তুমি মুসলমানদের দেখবে যে, তারা বিগত কোন একজন মুজতাহিদ বিদ্বানের মাযহাবের অনুসরণ করে থাকে। তারা মনে করে যে, একটি মাসআলাতেও যদি ঐ বিদ্বানের তাক্বলীদ হ'তে সে বেরিয়ে আসে, তাহ'লে হয়তবা সে মুসলিম মিল্লাত থেকেই খারিজ হয়ে যাবে। ঐ বিদ্বান যেন একজন নবী, যাকে তার কাছে প্রেরণ করা হয়েছে (كَأَنَّهُ نَبِيٌّ بُعِثَ إِلَيْــهِ) এবং যার অনুসরণ তার উপরে ফরয করা হয়েছে। অথচ ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বে কোন মুসলমান কোন একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসারী ছিল না।[৩৫]

---

৩৪. শাহ অলিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/১৫৩ পৃ.।

৩৫. শাহ অলিউল্লাহ, তাফহীমাতে ইলাহিয়াহ (ইউ,পি, বিজনৌর, ভারত ১৩৫৫/১৯৩৬) ১/১৫১ পৃ.। আত-তাফহীমাতুল ইলাহিইয়াহ কিতাবটি শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ)-এর একটি সিদ্ধান্তকারী গ্রন্থ। এখানে তিনি ঐসব কথা বলেছেন, যেগুলি তাঁর নিকট আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে তাফহীম করা হয়েছে। অর্থাৎ বিশেষ বুঝ দান করা হয়েছে। তাঁর ধারণামতে যখন যে ভাষায় তাঁকে বুঝ দেওয়া হ'ত, তখন সেই ভাষায় তিনি সেটা লিখতেন। ফলে উক্ত কিতাবে আরবী ও ফার্সী পৃথক ভাষায় 'তাফহীম' শিরোনামে বিভিন্ন অধ্যায় রচিত হয়েছে। এটি দু'খণ্ডে কয়েকশ' পৃষ্ঠার এক দুর্লভ গ্রন্থ। যা লেখক স্টাডি ট্যুরে লাহোরে গিয়ে দারুদ দা'ওয়াতিস সালাফিইয়াহ নামক বিখ্যাত আহলেহাদীছ লাইব্রেরীতে পেয়েছিলেন ও সেখান

আহলেহাদীছের ইস্তিদলালী পদ্ধতি (منهج الاستدلال عند أهل الحديث) :

শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) ইসলামী বিধান প্রণয়নে আহলেহাদীছ বিদ্বানদের অনুসৃত 'ইস্তিদলালী পদ্ধতি' বা দলীল গ্রহণের নীতিমালা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'তাঁরা (১) কোন বিষয়ে কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশ পেলে সেটাই গ্রহণ করেন। অন্যদিকে মুখ ফিরানোকে তাঁরা জায়েয মনে করেন না (২) কোন বিষয়ে কুরআনের কোন নির্দেশ অস্পষ্ট হ'লে সেক্ষেত্রে 'সুন্নাহ' ফায়ছালাকারী হবে। উক্ত হাদীছ সর্বত্র প্রচারিত থাকুক বা না থাকুক, তার উপরে ছাহাবীগণ বা ফক্বীহগণ আমল করুন বা না করুন। কোন বিষয়ে 'হাদীছ' পাওয়া গেলে তার বিপরীতে কোন ছাহাবীর 'আছার' কিংবা কোন মুজতাহিদের 'ইজতিহাদ' গ্রহণযোগ্য হবে না (৩) সার্বিক প্রচেষ্টার পরেও কোন বিষয়ে হাদীছ না পাওয়া গেলে আহলেহাদীছগণ ছাহাবী ও তাবেঈগণের যেকোন একটি জামা'আতের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেন। এক্ষেত্রে তাঁরা কোন একটি দল, শহর বা এলাকার অধিবাসীকে নির্দিষ্টভাবে অগ্রগণ্য মনে করেন না (৪) যদি কোন বিষয়ে খুলাফায়ে রাশেদীন ও ফক্বীহগণ একমত হন, তবে তাকেই তাঁরা যথেষ্ট মনে করেন (৫) কিন্তু যদি সেখানে মতভেদ থাকে, তবে তাঁদের মধ্যে যিনি সর্বাধিক বিদ্বান, পরহেযগার ও স্মৃতিধর তাঁর কথা অথবা তাঁদের মধ্যকার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কথাটি গ্রহণ করেন (৬) যখন কোন বিষয়ে সমশ্রেণীভুক্ত দু'টি বক্তব্য পাওয়া যায়, তখন সেক্ষেত্রে তাঁরা দু'টিকেই গ্রহণযোগ্য মনে করেন (৭) কিন্তু যখন সেটিতেও ব্যর্থ হন, তখন তাঁরা কিতাব ও সুন্নাতের সাধারণ নির্দেশ ও ইঙ্গিতসমূহ এবং উদ্দেশ্যাবলী অনুধাবন করেন। উক্ত বিষয়ে তাঁরা প্রচলিত কোন উছূল বা ব্যবহারিক আইন সূত্রের অনুসরণ করেন না। বরং

থেকে প্রয়োজনীয় অংশ ফটোকপি করে এনেছিলেন (তাং ২.১.১৯৮৯ খৃ.)। সেখান থেকে নিম্নের উদ্ধৃতিটি হুবহু উৎকলিত হ'ল।-

وكشف لى عن حقيقة الرأى الذى نطق بذمها السلف ونسبوا إليه رجالا من فقهاءهم... وترى العامة سيما اليوم فى كل قُطْر يتقيدون بمذهب من مذاهب المتقدمين يرون خروج الإنسان من مذهب من قلّده ولو فى مسئلة كالخروج من الملة، كأنه نبى بعث اليه وافترضت طاعته عليه وكان اوائل الأمة قبل المائة الرابعة غير متقيدين بمذهب واحد- (تفهيمات ١/١٥١)-

যে কথাটি তাঁরা উত্তমরূপে বুঝতে পারেন ও যা তাঁদের হৃদয়কে শীতল করে, তারই অনুসরণ করেন’।[৩৬]

হানাফী মাযহাবের বিস্তৃতির কারণ (سبب انتشار المذهب الحنفي) :

হানাফী মাযহাব সর্বত্র দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার মূল কারণ ছিল রাজনৈতিক। আব্বাসীয় খলীফা হারূনুর রশীদের আমলে (১৭০-১৯৩ হি.) ইমাম আবু হানীফার প্রধান শিষ্য আবু ইউসুফ (১১৩-১৮২ হি.) ইসলামী খেলাফতের ইতিহাসে প্রথম নিযুক্ত ‘ক্বাযিউল কুযাত’ বা প্রধান বিচারপতি হওয়ার সুবাদে ইরাক, ইরান ও মধ্য তুর্কিস্তান সহ খেলাফতের সর্বত্র হানাফী মাযহাবের ফৎওয়া ও সিদ্ধান্তসমূহ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) এদিকে ইঙ্গিত করে বলেন, فَكَانَ سَبَبًا لِظُهُوْرِ مَذْهَبِــهِ ‘এটাই ছিল তাঁর মাযহাব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার মূল কারণ’।[৩৭] ভারতের খ্যাতনামা হানাফী আলেম আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (১২৬৪-১৩০৪/১৮৪৮-৮৬) একথা সমর্থন করে বলেন, هُوَ اَوَّلُ مَنْ نَشَرَ عِلْمَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ فِىْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَ ثَبَّــتَ الْمَــسَائِلَ– ‘তিনিই প্রথম আবু হানীফার ইল্‌ম পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দেন ও তাঁর মাসআলাসমূহ প্রতিষ্ঠিত করেন’।[৩৮]

দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ইসলাম এসেছিল রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)* ও খলীফাদের আমলেই আরব বণিক ও মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামের মাধ্যমে। বিভিন্ন মাযহাব সৃষ্টির পূর্বে আগত সেই ইসলাম ছিল হাদীছ ভিত্তিক নির্ভেজাল ইসলাম। নিঃসন্দেহে তাঁরা ছিলেন ‘আহলুল হাদীছ’। তখনকার মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবন পরিচালিত হ’ত হাদীছের আলোকে। তাই আজও কোন কিছু হারিয়ে গেলে ও খুঁজে না পেলে বাঙ্গালী মুসলমানরা বলে, জিনিসটির হদিস পাওয়া গেল না’। কিন্তু পরবর্তীকালে হানাফী মতাবলম্বী সেনাপতি

---

৩৬. শাহ অলিউল্লাহ, ‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ’ (কায়রো : দারুত তুরাছ, ১ম সংস্করণ ১৩৫৫/১৯৩৬), ১/১৪৯ পৃ., ‘আহলুল হাদীছ ও আহলুর রায়-এর পার্থক্য’ অনুচ্ছেদ।

৩৭. শাহ অলিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/১৪৬ ‘ফক্বীহদের মাযহাবী পার্থক্যের কারণ সমূহ’ অনুচ্ছেদ।

৩৮. মুক্বাদ্দামা শরহ বেক্বায়াহ (দেউবন্দ ছাপা: তাবি) ৩৮ পৃ.।

ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক ৬০২ হিজরী মোতাবেক ১২০১ খৃষ্টাব্দের সামরিক বিজয় এবং তাঁর সাথে ও পরে আগত তুর্কী হানাফী আলেম ও মারেফতী ফকীরদের মাধ্যমে প্রচারিত হানাফী ও ছূফী ইসলাম প্রধানতঃ রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় এদেশে প্রসার লাভ করে। যার অধিকাংশ আমল ছিল শিরক ও বিদ'আতে ভরা। যদিও সোনারগাঁওয়ের মুহাদ্দিছ শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (মৃ. ৭০০ হি./১৩০০খৃ.) ও তাঁর শিষ্যদের প্রচেষ্টায় আহলেহাদীছ আন্দোলন চালু থাকে।

উল্লেখ্য যে, বোখারা (রাশিয়া) থেকে আগত এই স্বনামধন্য মুহাদ্দিছ-এর মাধ্যমেই উপমহাদেশের বুকে বাংলাদেশেই সর্বপ্রথম বুখারী ও মুসলিমের দরস চালু হয়। তিনি সোনারগাঁওয়ে দীর্ঘ ২২ বছর যাবৎ ছহীহায়েন-এর দরস দিয়েছিলেন। বলা চলে যে, প্রধানতঃ তাঁরই প্রচেষ্টায় এদেশে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সর্বাধিক প্রসার লাভ করে। পরবর্তীতে তুর্কী, মোগল, শী'আ, পাঠান, আফগান প্রভৃতি দলের হাত বদল হয়ে যে ইসলাম এদেশে স্থিতি লাভ করে, তা হয়ে পড়ে শিরক, বিদ'আত ও বিভিন্ন কুসংস্কারে ভরা জগাখিচুড়ী ইসলাম। বলা বাহুল্য, আজও সে অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। তবে বর্তমানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর গতি বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষ দ্রুত হক-এর দিকে ফিরে আসছে। *ফালিল্লাহিল হাম্দ।*

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নীতি (مسلك أبي حنيفة رحـــ) :

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) তাঁর রায়-এর তাক্বলীদ বা অন্ধ অনুসরণ করতে তীব্রভাবে নিষেধ করে গিয়েছেন এবং 'যখন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যাবে, তখন সেটাই আমার মাযহাব' বলে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা দিয়ে গিয়েছেন *(দ্রঃ টীকা ৩)*। সেকারণ আব্দুল ওয়াহ্হাব শা'রানী হানাফী (৮৯৮-৯৭৩ হি.) বলেন,

إِنَّهُ لَوْ عَاشَ حَتَّى دُوِّنَتْ أَحَادِيْثُ الشَّرِيْعَةِ .... لَأَخَذَ بِهَا وَ تَرَكَ كُلَّ قِيَاسٍ كَانَ قَاسَهُ وَ كَانَ الْقِيَاسُ قَلَّ فِيْ مَذْهَبِهِ كَمَا قَلَّ فِيْ مَذْهَبِ غَيْرِهِ..

'যদি (তৃতীয় শতাব্দী হিজরীতে) হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনের স্বর্ণযুগে ইমাম আবু হানীফা বেঁচে থাকতেন, তাহ'লে তিনি সেগুলি গ্রহণ করতেন ও যত ক্বিয়াসী ফৎওয়া দিয়েছেন সবই বাদ দিতেন এবং তাঁর মাযহাবেও ক্বিয়াস কম হ'ত, যেমন অন্যদের মাযহাবে হয়েছে। .... যে কথা বলা হয়ে থাকে যে, ইমাম আবু হানীফা ক্বিয়াসকে দলীলের উপরে স্থান দিতেন, এটা তাঁর মুক্বাল্লিদগণের কথা মাত্র। যারা ইমামের ক্বিয়াসের উপরে আমল করাকে

অপরিহার্য গণ্য করেছেন এবং হাদীছকে পরিত্যাগ করেছেন, যা ইমামের মৃত্যুর পরে ছহীহ প্রমাণিত হয়েছে। এ ব্যাপারে ইমাম দায়ী নন, বরং দায়ী তার অন্ধ অনুসারীবৃন্দ’।[৩৯]

ফলকথা আহলুল হাদীছগণের বিপরীতে আহলুর রায়গণের ক্বিয়াস স্ব স্ব মাযহাবী বিদ্বানদের রচিত ব্যবহারিক আইনসূত্রসমূহ বা উছূলে ফিক্বহের উপরে ভিত্তিশীল, হাদীছের উপরে নয়।

মুজতাহিদগণের বিভক্তি (أصناف المجتهدين) :

হিজরী ষষ্ঠ শতকের খ্যাতনামা বিদ্বান আবুল ফাৎহ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল করীম শহরস্তানী (৪৭৯-৫৪৮ হি.) বলেন,

ثُمَّ الْمُجْتَهِدُوْنَ مِنْ أَئِمَّةِ الْأُمَّةِ مَحْصُوْرُوْنَ فِيْ صِنْفَيْنِ لاَ يَعْدُوَانِ إِلَى ثَالِثٍ : أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ وَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ، أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ وَ هُمْ أَهْلُ الْحِجَازِ ... وَ إِنَّمَا سُمُّوْا أَصْحَابَ الْحَدِيْثِ لِأَنَّ عِنَايَتَهُمْ بِتَحْصِيْلِ الْأَحَادِيْثِ وَ نَقْلِ الْأَخْبَارِ وَ بِنَاءِ الْأَحْكَامِ عَلَى النُّصُوْصِ وَ لاَيَرْجِعُوْنَ إِلَى الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ وَ الْخَفِيِّ مَا وَجَدُوْا خَبَرًا أَوْ أَثَرًا ... وَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ وَهُمْ أَهْلُ الْعِرَاقِ هُمْ أَصْحَابُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانِ بْنِ الثَّابِتِ ... وَ إِنَّمَا سُمُّوا أَصْحَابَ الرَّأْيِ لِأَنَّ أَكْثَرَ عِنَايَتِهِمْ بِتَحْصِيْلِ وَجْهِ الْقِيَاسِ وَالْمَعْنَى الْمُسْتَنْبَطِ مِنَ الْأَحْكَامِ وَ بِنَاءِ الْحَوَادِثِ عَلَيْهَا وَ رُبَّمَا يُقَدِّمُوْنَ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ عَلَى آحَادِ الْأَخْبَارِ-

‘উম্মতের মুজতাহিদ ইমামগণ দু’ভাগে বিভক্ত, তৃতীয় কোন ভাগে নয়। আছহাবুল হাদীছ ও আছহাবুর রায় (আহলুল হাদীছ ও আহলুর রায়)। আহলুল হাদীছগণ হেজায (মক্কা-মদীনা)-এর অধিবাসী। ...তাদেরকে ‘আহলুল হাদীছ’ এ জন্য বলা হয় যে, তাদের সার্বিক লক্ষ্য নিয়োজিত থাকে হাদীছ সংগ্রহের প্রতি এবং তাঁরা সমস্ত আদেশ-নিষেধের ভিত্তি রাখেন (কুরআন-হাদীছের) দলীল সমূহের উপর। হাদীছ বা আছার পেলে তাঁরা কোন প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ক্বিয়াসের দিকে ফিরে তাকান না...। পক্ষান্তরে আহলুর রায়গণ হ’লেন ইরাকের অধিবাসী। তাঁরা আবু হানীফা নু‘মান বিন ছাবিত-এর অনুসারী। ...তাদেরকে ‘আহলুর রায়’ এজন্য বলা হয় যে,

৩৯. আব্দুল ওয়াহ্হাব শা‘রানী, মীযানুল কুবরা (দিল্লী ছাপা : ১২৮৬ হি.) ১/৭৩ পৃ.।

তাদের অধিকতর লক্ষ্য থাকে ক্বিয়াসের কারণ অনুসন্ধানের প্রতি ও কুরআন-হাদীছের আহকাম হ'তে সৃষ্ট মর্মার্থের প্রতি। তার উপরেই তাঁরা উদ্ভূত ঘটনাসমূহের ভিত্তি স্থাপন করেন। কখনো কখনো তাঁরা 'খবরে ওয়াহেদ' পর্যায়ের হাদীছের উপরে প্রকাশ্য ক্বিয়াসকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন'।[৪০]

আহলুল হাদীছের নীতির সপক্ষে মত প্রকাশ করতে গিয়ে হিজরী পঞ্চম শতকের মুজাদ্দিদ আবু মুহাম্মাদ আলী ইবনু হায্ম আন্দালুসী (রহঃ) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, 'ছাহাবা, তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈন-এর প্রথম হ'তে শেষ পর্যন্ত সকলের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত বা ইজমা এই যে, তাঁদের কোন একজন ব্যক্তির সকল কথার প্রতি কর্ণপাত করা যাবে না। অতএব ঐ ব্যক্তি জেনে রাখুক, যে ব্যক্তি আবু হানীফার সকল কথা গ্রহণ করেছে, কিংবা মালেক-শাফেঈ বা আহমাদের সকল কথাকে গ্রহণ করেছে। তাঁদের কোন কথা ছাড়েনি বা অন্যের কথার প্রতি দৃকপাত করেনি, কুরআন ও সুন্নাহ্র আদেশ-নিষেধের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করেনি, ঐ ব্যক্তি নিঃসন্দেহে ইজমায়ে উম্মতের বিরোধিতা করেছে। এ নীতির অনুসারী কোন লোক ছাহাবা, তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈনের তিনটি প্রশংসিত যুগে ছিল না। ঐ ব্যক্তি মুমিনদের গৃহীত পথের বাইরে গিয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে ঐ অবস্থা হ'তে পানাহ দিন'।[৪১]

এক্ষণে আমাদেরকে ভেবে দেখতে হবে আমরা আল্লাহ-প্রেরিত 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে জীবন সমস্যার সমাধান নেব? না মানুষের রচিত ফিক্বহের ভিত্তিতে সমাধান নেব। আমরা বুখারী, মুসলিম, আবুদাঊদ, তিরমিযীকে অগ্রাধিকার দেব? নাকি পরবর্তীতে সৃষ্ট একটি নির্দিষ্ট মাযহাবী ফিক্বহ গ্রন্থ কুদূরী, শরহে বেকায়া, হেদায়াহ, আলমগীরীকে অগ্রাধিকার দেব? আমরা কি হাদীছপন্থী হব, নাকি রায়পন্থী হব?

জানা আবশ্যক যে, নবীদের আগমন শেষ হয়ে গেছে, অহি-র অবতরণ বন্ধ হয়ে গেছে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কোন পরিবর্তন নেই। কিন্তু যুগে যুগে 'রায়'-এর পরিবর্তন ঘটেছে, আজও ঘটছে, ভবিষ্যতেও ঘটবে। বর্তমানে মুসলিম তরুণ সমাজ ক্রমেই বিজাতীয় রায়ের অনুসারী হয়ে পড়ছে। ফলে নানা মুণীর নানা মতে মুসলিম সমাজ আজ শতধা বিভক্ত।

---

৪০. আবুল ফাৎহ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল করীম শহরস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, তাবি) ১/২০৬-২০৭ পৃ.।

৪১. শাহ অলিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (কায়রো ছাপা ১৩৫৫ হি.) ১/১৫৪-৫৫ পৃ.।

বিশৃঙ্খল এই বিরাট উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ ও কল্যাণমুখী করার একটাই মাত্র পথ রয়েছে। আর সেটা হ'ল, সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র দিকে ফিরে আসা। পবিত্র কুরাআন ও ছহীহ হাদীছের ফায়ছালার সম্মুখে নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করা। যুগ যুগ ধরে আহলেহাদীছ আন্দোলন এই কল্যাণ লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়ে এসেছে, আজও হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে ইনশাআল্লাহ।

জামা'আতে আহলেহাদীছ যুগে যুগে

(جماعة أهل الحديث على مَرِّ العصور)

ছাহাবী ও তাবেঈগণ প্রথম যুগের আহলেহাদীছ ছিলেন। তাঁদের হাতে বিজিত ও তাঁদের মাধ্যমে প্রচারিত তৎকালীন পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার মুসলিমগণ সকলেই 'আহলেহাদীছ' ছিলেন। ৩৭ হিজরী থেকে বিদ'আতীদের উদ্ভব হতে থাকলে তাদের বিপরীতে আহলুল হাদীছগণ স্বতন্ত্র নামে ও বৈশিষ্ট্যে পরিচিত হ'তে থাকেন। অতঃপর ৪র্থ শতাব্দী হিজরীতে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় তাক্বলীদ ভিত্তিক বিভিন্ন মাযহাব বিস্তৃতি লাভ করে। ফলে তৎকালীন পৃথিবীর মুসলিম অঞ্চলসমূহে আহলুল হাদীছের পাশাপাশি বিভিন্ন মাযহাবী দলেরও সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন ফিলিস্তীনের প্রখ্যাত মুসলিম ভূ-পর্যটক শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-বিশারী আল-মাক্বদেসী (৩৩৬-৩৮০ হি.) চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর মাঝামাঝি সময়ে পৃথিবীর মুসলিম এলাকাসমূহ পরিভ্রমণে বের হন। তৎকালীন বিশ্বের আহলেহাদীছ অধ্যুষিত এলাকাসমূহের কিছু কিছু তথ্য তিনি স্বীয় 'আহসানুত তাক্বাসীম ফী মা'রিফাতিল আক্বালীম' নামক ভ্রমণ গ্রন্থে বিবৃত করেছেন। তিনি বলেন, 'হেজায তথা মক্কা-মদীনা এলাকায় আহলে সুন্নাত *(পৃ. ৯৬)* এবং আব্বাসীয় রাজধানী বাগদাদের অধিকাংশ ফক্বীহ ও বিচারপতি হানাফী ছিলেন *(পৃ. ১২৭)*। উমাইয়াদের রাজধানী দামেশ্ক্ব ও সিরিয়ার লোকদের সমস্ত আমল আহলেহাদীছ মাযহাবের উপরেই (وَالْعَمَلُ كَانَ فِيْهِ عَلَى مَذْهَبِ أَصْحَابِ الْحَـــدِيْثِ) আছে। এখানে মু'তাযিলাদের কোন স্থান নেই। মালেকী বা দাঊদীও নেই' *(পৃ. ১৭৯-৮০)*।

অতঃপর মাক্বদেসী ৩৭৫ হিজরীতে তৎকালীন ভারতের ইসলামী রাজধানী সিন্ধুর মানছূরায় আগমন করেন। মানছূরাহ (করাচী) সম্পর্কে তিনি বলেন, 'সেখানকার অধিকাংশ (মুসলিম) অধিবাসী আহলেহাদীছ' (أَكْثَرُهُمْ أَصْـــحَابُ

(حَـــدِيْثٍ)। ক্বাযী আবু মুহাম্মাদ মানছূরী নামে সেখানে দাঊদী মাযহাবের একজন ইমাম আছেন। তাঁর লিখিত অনেক মূল্যবান কেতাব রয়েছে। মুলতানের অধিবাসীরা শী'আ মতাবলম্বী। প্রত্যেক শহরেই কিছু কিছু হানাফী ফক্বীহ রয়েছেন। এখানে মালেকী বা মু'তাযেলী কেউ নেই, হাম্বলীও নেই'।[৪২]

মাক্বদেসীর অর্ধশত বছর পরে ঐতিহাসিক আবু মানছূর আব্দুল ক্বাহির বাগদাদী (৩৭০-৪২৯ হি.) তৎকালীন পৃথিবীতে আহলেহাদীছদের অবস্থান সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেন,

ثُغُوْرُ الرُّوْمِ وَالْجَزِيْرَةِ وَ ثُغُوْرُ الشَّامِ وَ ثُغُوْرُ آذَرْبَيْجَانَ وَبَابِ الْأَبْوَابِ كُلُّهُمْ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْحَدِيْثِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَ كَذَالِكَ ثُغُوْرُ أَفْرِيْقِيَّةَ وَ أَنْدَلُسَ وَ كُلُّ ثغرٍ وَرَاءِ بَحْرِ الْمَغْرِبِ أَهْلُهُ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ وَ كَذَالِكَ ثُغُـــوْرُ الْيَمَنِ عَلَى سَاحِلِ الزَّنْجِ ، وَأَمَّا ثُغُوْرُ أَهْلِ مَا وَرَاءِ النَّهْرِ فِيْ وُجُوْهِ التُّرْكِ وَ الصِّيْنِ فَهُمْ فَرِيْقَانِ: إِمَّا شَافِعِيَّةٌ وَإِمَّا مِنْ أَصْحَابِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ–

'রূম সীমান্ত, আলজিরিয়া, সিরিয়া, আযারবাইজান, বাবুল আবওয়াব (মধ্য তুর্কিস্তান) প্রভৃতি এলাকার সকল মুসলিম অধিবাসী আহলে সুন্নাতের 'আহলেহাদীছ' মাযহাবের উপরে ছিলেন। এমনিভাবে আফ্রিকা, স্পেন ও পশ্চিম সাগরের পশ্চাদ্বর্তী দেশসমূহের সকল মুসলমান 'আহলেহাদীছ' ছিলেন। একইভাবে আবিসিনিয়ার উপকূলবর্তী ইয়ামনের সকল অধিবাসী 'আহলেহাদীছ' ছিলেন। তবে তুরস্ক ও চীন অভিমুখী মধ্য তুর্কিস্তান সীমান্তের অধিবাসীদের মধ্যে দু'টি দল ছিল : একদল শাফেঈ ও একদল আবু হানীফার অনুসারী'।[৪৩]

শামসুদ্দীন মাক্বদেসী ও আব্দুল ক্বাহির বাগদাদীর উপরোক্ত বর্ণনা হ'তে প্রমাণিত হয় যে, বাগদাদী খেলাফতের স্কন্ধে সওয়ার হয়ে 'আহলুর রায়' ও মু'তাযিলাদের চরম রাজনৈতিক ও মাযহাবী নির্যাতন সত্ত্বেও পঞ্চম শতাব্দী হিজরী পর্যন্ত খোদ মক্কা-মদীনা ও সিরিয়া সহ ইউরোপ, আফ্রিকা, সোভিয়েত রাশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, নিকটপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ

---

৪২. শামসুদ্দীন আল-মাক্বদেসী, আহসানুত তাক্বাসীম ২য় সংস্করণ (লণ্ডন: ই, জে, ব্রীল ১৯০৬); ঐ (কায়রো: ১৪১১/১৯৯১) পৃ. ৪৮১; গ্রন্থটি ৩৭৫ হিজরীতে লিখিত হয়।

৪৩. আব্দুল ক্বাহির বাগদাদী, কিতাবুল উছূলিদ্দীন (ইস্তাম্বুল: দাওলাহ প্রেস ১৩৪৬/১৯২৮) ১/৩১৭ পৃ.।

Contents

শহরে এবং সুদূর সিন্ধু পর্যন্ত আহলেহাদীছ জনগণের সংখ্যাধিক্য বজায় ছিল, যা সত্যিই বিস্ময়ের ব্যাপার বৈ কি!

৩৭৫ হিজরীর কিছু পরে মানছূরার শাসন ক্ষমতা ইসমাঈলী শী'আদের হাতে চলে যায়। অন্যদিকে ৬০২ হিজরী মোতাবেক ১২০১ খৃষ্টাব্দ থেকে দিল্লীতে ও বাংলাদেশে শুরু হয় 'আহলুর রায়' হানাফী শাসন। তখন থেকেই কখনও গযনভী, কখনও আফগানী, কখনও তুর্কীদের দ্বারা উপমহাদেশ শাসিত হয় এবং মূল আরবীয় শাসনের অবসান ঘটে। ফলে একদিকে রাজনৈতিক অনুদারতা, অন্যদিকে তাক্বলীদপন্থী আলেমদের সংকীর্ণতা, জনসাধারণের অজ্ঞতা ও আহলেহাদীছ আলেমদের স্বল্পতার কারণে আহলেহাদীছ আন্দোলন ভারতবর্ষে ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসে।

অতঃপর দ্বাদশ শতাব্দীতে এসে আল্লাহ পাকের খাছ মেহেরবাণীতে শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬ হি.)-এর শাণিত যুক্তি ও ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে নিরপেক্ষভাবে হাদীছ অনুসরণের জায্বা সৃষ্টি হয় এবং তাঁর পরে তদীয় পুত্রগণ ও মুজাহিদ পৌত্র শাহ ইসমাঈল শহীদ (১১৯৩-১২৪৬ হি.)-এর সূচিত 'জিহাদ আন্দোলন'-এর মাধ্যমে সারা ভারতে একটি সামাজিক বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটে, যা আহলেহাদীছ আন্দোলনে জোয়ার সৃষ্টি করে। পাক-ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বর্তমানে বসবাসরত প্রায় ছয় কোটি আহলেহাদীছ জনগণ সেই বিপ্লবেরই ফসল।[৪৪] যাদের রক্তে-মাংসে, অস্থি-মজ্জায় বালাকোট, বাঁশের কেল্লা, মুল্কা, সিত্তানা, আম্বালা, চামারকান্দ, আসমাস্ত ও আন্দামানের রক্তাক্ত স্মৃতিসমূহ, জেল-যুলুম, ফাঁসি, সম্পত্তি বাযেয়াফত, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও কালাপানির অবর্ণনীয় নির্যাতন, গাযী ও শহীদী রক্তের অমলিন ছাপসমূহ আজও ইতিহাসে ভাস্বর হয়ে আছে। যুলুম ও নির্যাতনের আগুনে পোড়া নিখাদ তাওহীদবাদী 'জামা'আতে আহলেহাদীছ' তাই চিরকালীন জিহাদী উত্তরাধিকারের নাম। যেকোন মূল্যের বিনিময়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারকে অক্ষুণ্ন রাখার চিরন্তন শহীদী কাফেলার নাম। মহান আল্লাহ বলেন, –وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 'তোমরা হীনবল হয়ো না, চিন্তান্বিত হয়ো না, ঈমানদার হ'লে তোমরাই বিজয়ী' *(আলে ইমরান ৩/১৩৯)*।

৪৪. বর্তমানে প্রায় দ্বিগুণ। -প্রকাশক ।

ফের্কাবন্দী বনাম আহলেহাদীছ
(افتراق الأمة وأهل الحديث)

আল্লাহ্‌র হুকুম ছিল, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُــوْا *‘ওয়া‘তাছিমূ বিহাবলিল্লা-হি জামী‘আঁও অলা তাফাররাক্বূ’*। অর্থ: ‘তোমরা সকলে মিলে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। (সাবধান)! দলে দলে বিভক্ত হয়ো না’ *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*। কিন্তু রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*-এর ইন্তেকালের কিছুদিন পর হ’তেই মুসলমানরা আপোষে দলাদলি ও ফির্কাবন্দীতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে অধঃপতন ত্বরান্বিত হয়।

মুসলমানদের মধ্যে এই দল বিভক্তির কারণ ছিল মূলতঃ চারটি।-

১. ইহূদী-খৃষ্টানদের প্ররোচনা। ২. রাজনৈতিক স্বার্থদ্বন্দ্ব। ৩. বিভিন্ন বিজাতীয় প্রথা ও দর্শন চিন্তার অনুপ্রবেশ। ৪. শরী‘আতের ব্যাখ্যাগত মতভেদ।

প্রথমোক্ত কারণ হিসাবে আমরা দেখতে পাই যে, তৃতীয় খলীফা হযরত ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতের (২৩-৩৫ হি.) শেষ দিকে ইয়ামনের জনৈকা নিগ্রো মাতার গর্ভজাত ইহূদী সন্তান আব্দুল্লাহ বিন সাবা বাহ্যিকভাবে মুসলমান হয়। পরে তারই প্ররোচনায় মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম ‘সাবাঈ’ ও ‘ওছমানী’ দু’টি পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়।

অতঃপর (২) বিদ্রোহী সাবাঈ দলের হাতেই মহান খলীফা ওছমান (রাঃ) নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেন। পরবর্তীতে হযরত আলী (রাঃ) ও মু‘আবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যেকার রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে খারেজী ও শী‘আ দলের উদ্ভব ঘটে এবং চরমপন্থী খারেজীদের হাতে চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ) শহীদ হন।

(৩) উপরোক্ত রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সূত্র ধরে আক্বীদা ও উছূলী বিতর্ক শুরু হয়। ফলে ক্বাদারিয়া, জাবরিয়া, মুরজিয়া, মু‘তাযিলা প্রভৃতি ভ্রান্ত দলের উদ্ভব ঘটে। শী‘আরা আলী ও মিক্বদাদ (রাঃ) সহ কয়েকজন ব্যতীত বাকীসব ছাহাবীকে কাফের বলে। ক্বাদারিয়াগণ তাক্বদীরকে অস্বীকার করে। জাবরিয়াগণ তার বিপরীতে অদৃষ্টবাদী হয়ে যায়। খারেজীগণ কবীরা গোনাহগারকে কাফের ও তার রক্ত হালাল গণ্য করে। তার বিপরীতে মুরজিয়াগণ কবীরা গোনাহগারকে পূর্ণ মুমিন বলে। মু‘তাযিলা যুক্তিবাদীগণ

কবীরা গোনাহগারকে না মুমিন, না কাফের বলে এক বিভ্রান্তিকর আক্বীদার জন্ম দেয়। তারা আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে অস্বীকার করে।

সেইসাথে নওমুসলিমদের মাধ্যমে ও আরবীতে অনূদিত অনারব গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে বিজাতীয় প্রথা ও দর্শন চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটে। যার ফলে মুসলিম সমাজে নানাবিধ শিরক ও বিদ'আত দেখা দেয়। অদ্বৈতবাদ, সর্বেশ্বরবাদ প্রভৃতি কুফরী মতবাদ মা'রেফাতের নামে মুসলমানদের মধ্যে প্রবেশ করে। এভাবে বিভিন্ন বিজাতীয় দর্শন চিন্তা মুসলমানদের মাঝে আক্বীদাগত ফের্কা সৃষ্টিতে বারি সিঞ্চন করে।

(৪) এতদ্ব্যতীত শরী'আতের ব্যাখ্যাগত মতভেদের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয় নানা মাযহাব ও তরীকা। শী'আ-সুন্নী বিভেদ ছাড়াও সুন্নীরা হানাফী, শাফেঈ, মালেকী, হাম্বলী চারটি ফের্কায় বিভক্ত হয়ে যায়। অতঃপর এক মাযহাবের লোকদের জন্য অন্য মাযহাবের ফৎওয়া মানা নিষিদ্ধ করা হয়। এভাবে ইসলামের মধ্যে ফের্কাবন্দীর ইতিহাস একটি দুঃখজনক অভিশাপ হিসাবে দিন দিন প্রলম্বিত হ'তে থাকে।

ইসলামের মধ্যকার বিভিন্ন মাযহাব অপর মাযহাবে গৃহীত অনেক ছহীহ সিদ্ধান্ত, যার পক্ষে কিতাব ও সুন্নাতের ছহীহ দলীল রয়েছে, তাকে শুধুমাত্র নিজেদের তাক্বলীদী গোঁড়ামীর কারণে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় প্রত্যাখ্যান করেছে। অতঃপর নিজেদের এই অনুদারতা ঢাকবার জন্য অপর মাযহাবের গৃহীত ছহীহ হাদীছকে অস্বীকার করেছে অথবা 'মানসূখ' (হুকুম রহিত) বলে দাবী করেছে। কিংবা তার দূরতম ব্যাখ্যা বা অপব্যাখ্যায় লিপ্ত হয়েছে অথবা 'এটাও ঠিক ওটাও ঠিক' বলে এড়িয়ে গেছে। এঁরা জাঁকজমকের সাথে 'খতমে বুখারী'-র অনুষ্ঠান করেন, অথচ বুখারীর হাদীছ মানেন না। ছহীহ বুখারীর অনুবাদক হ'তে গর্ববোধ করেন, অথচ অনুবাদে কারচুপি করেন। আবার অযৌক্তিক টীকা-টিপ্পনীর ছুরি চালিয়ে স্বীয় মাযহাব বিরোধী ছহীহ হাদীছগুলিকে কচুকাটা করেন। তাদের লিখিত তাফসীর, হাদীছ ও ধর্মীয় গ্রন্থসমূহের প্রায় সর্বত্র এই অপতৎপরতা বিদ্যমান। তাদের মাদ্রাসাগুলিতে সব শ্রেণীতে নিজেদের ফিক্বহ পড়িয়ে ছাত্রদের মগয তৈরী করে নিয়ে শেষের দাওরা শ্রেণীতে বরকতের নামে কুতুবে সিত্তাহ্‌র বাছাইকৃত অংশসমূহ পড়ানো হয়। অথচ হাদীছের উপর আমল করা হয় না। বলা বাহুল্য এইসব তাক্বলীদী গোঁড়ামীর ক্যান্সারে আক্রান্ত লোকদের দ্বারাই ইসলামী ঐক্য ইসলামের নামেই ভেঙ্গে খানখান হয়ে গেছে এবং তা এখন সামাজিকভাবে স্থায়ী রূপ ধারণ করেছে।

বিভিন্ন ফের্কা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, সকল মাযহাব ও তরীকার অনুসারীরা তাদের গৃহীত ফৎওয়াসমূহ কুরআন ও সুন্নাহ থেকেই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। পবিত্র কুরআনের যে সকল আয়াত এবং যে সকল হাদীছ ও আছার তাদের মাযহাবের অনুকূলে হ'ত, সেগুলি তারা সানন্দে গ্রহণ করতেন। কিন্তু যেগুলি তার বিরোধী হ'ত, তারা সেগুলির দূরতম ব্যাখ্যায় লিপ্ত হ'তেন কিংবা 'মানসূখ' বলে পরিত্যাগ করতেন। শী'আরা তো রাজনৈতিক কারণে হযরত আলী (রাঃ)-এর মর্যাদা বর্ণনায় তিন লাখ জাল হাদীছ বানিয়ে নিয়েছেন।[৪৫] প্রচলিত কুরআন মাজীদ, যা 'মুছহাফে উছমানী' নামে পরিচিত, তার বিপরীতে তাদের আবিষ্কৃত এর তিনগুণ বড় 'মুছহাফে ফাতেমা' নামক তথাকথিত কুরআন গ্রন্থে প্রচলিত কুরআন মাজীদের একটি হরফও নেই বলে তারা দাবী করেন।[৪৬] এমনিভাবে উমাইয়া, আব্বাসীয়, শী'আ, খারেজী, হানাফী, শাফেঈ প্রভৃতি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দলের লোকেরা নিজ নিজ দলের ও মাযহাবের পক্ষে ও অপর মাযহাবের বিপক্ষে কত যে জাল ও মিথ্যা হাদীছ রটনা করেছে, তার ইয়ত্তা নেই।[৪৭]

এ থেকে বাঁচার একটাই মাত্র পথ খোলা আছে। আর তা হ'ল মুসলমানকে সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রকাশ্য অর্থের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। কেবল এভাবেই তাদের হারানো ঐক্য ও শক্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

আহলুল হাদীছ ও আহলুস সুন্নাহ
(أهل الحديث وأهل السنة)

'হাদীছ' অর্থ বাণী এবং 'সুন্নাহ' অর্থ রীতি। পারিভাষিক অর্থে রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*-এর কথা, কর্ম ও সম্মতিকে 'হাদীছ' বলা হয়। হাদীছ ও সুন্নাহ্র মধ্যে আভিধানিক অর্থে কিছু পার্থক্য থাকলেও পারিভাষিক ও প্রায়োগিক অর্থে কোন পার্থক্য নেই। কেননা উভয়ের

---

৪৫. ড. মুছতফা সাবাঈ, আস-সুন্নাহ, পৃ. ৮১।

৪৬. ইহসান ইলাহী যাহীর, আশ-শী'আহ ওয়াস সুন্নাহ (লাহোর : ইদারাহ তারজুমানুস সুন্নাহ, তাবি) পৃ. ৮০-৮১।

৪৭. ড. মুছতফা সাবাঈ, আস-সুন্নাহ, পৃ. ৭৮-৭৯; ইউসুফ জয়পুরী, হাক্বীক্বাতুল ফিক্বহ (বোম্বাই : তাবি, তাহকীক : দাঊদ রায) দুর্রে মুখতার-এর বরাতে, পৃ. ১৮৩-৮৫; থিসিস পৃ. ১৮০-৮২ টীকা ৫৯-৬০ দ্রষ্টব্য।

বিষয়বস্তু এক এবং সবকিছুই হাদীছের মাধ্যমে লিখিত রূপ লাভ করেছে। হাদীছ ও ফিক্বহে 'আহলুস সুন্নাহ' ও 'আহলুল হাদীছ' একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে পরবর্তী যুগে 'আহলুর রায়'-এর বিপরীতে 'আহলুল হাদীছ' নামটি বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করে।

৩৭ হিজরী থেকে ইসলামের স্বচ্ছ সলিলে ভেজাল মিশ্রিত হ'তে শুরু করেছিল। কিন্তু ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযামের পবিত্র উদ্যোগ এসবের প্রসার রোধ করেছিল। তাঁরা এসব ফিৎনা হ'তে মুসলিম মিল্লাতকে মুক্ত রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং বিদ'আতপন্থীদের বিপরীতে নিজেদেরকে 'আহলুস সুন্নাহ' ও 'আহলুল হাদীছ' নামে অভিহিত করেন। অতঃপর তাঁদের অনুসারী হকপন্থী মুসলমানরাও নিজেদেরকে 'আহলুল হাদীছ' নামে অভিহিত করেন। যেমন খ্যাতনামা তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (৩৩-১১০ হি.) বলেন,

لَمْ يَكُوْنُوْا يَسْأَلُوْنَ عَنِ الْإِسْنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوْا سَمُّوْا لَنَا رِجَالَكُمْ، فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ وَ يُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلاَ يُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ-

'লোকেরা ইতিপূর্বে কখনও হাদীছের সনদ বা সূত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত না। কিন্তু যখন ফিৎনার যুগ এল, তখন লোকেরা বলতে লাগল আগে তোমরা বর্ণনাকারীদের পরিচয় বল। অতঃপর যদি দেখা যেত যে, বর্ণনাকারী 'আহলে সুন্নাত' দলভুক্ত, তাহ'লে তাঁর বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত। কিন্তু 'আহলে বিদ'আত' দলভুক্ত হ'লে তার বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত না।[৪৮] ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) এজন্য বলেন,

وَمِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مَذْهَبٌ قَدِيْمٌ مَعْرُوْفٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ اللهُ أَبَا حَنِيْفَةَ وَ مَالِكًا وَ الشَّافِعِيَّ وَ أَحْمَدَ، فَإِنَّهُ مَذْهَبُ الصَّحَابَةِ الَّذِيْنَ تَلَقَّوْهُ عَنْ نَبِيِّهِمْ-

'আবু হানীফা, মালেক, শাফেঈ ও আহমাদের জন্মের বহু পূর্ব হ'তে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের প্রাচীন একটি মাযহাব সুপরিচিত ছিল। সেটি হ'ল ছাহাবায়ে কেরামের মাযহাব, যারা তাঁদের নবীর কাছ থেকে সরাসরি ইল্ম

---

৪৮. মুক্বাদ্দামা মুসলিম, (বৈরূত: দরুল ফিক্র ১৪০৩/১৯৮৩) পৃ. ১৫।

হাছিল করেছিলেন’।[৪৯] ছহাবায়ে কেরামের জামা‘আতকে যে ‘আহলুল হাদীছ’ বলা হ’ত, সেকথা আমরা ইতিপূর্বে ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী, ইমাম শা‘বী, ইবনু হাযম আন্দালুসী প্রমুখের বক্তব্যে অবহিত হয়েছি *(দ্রঃ টীকা ১, ২, ১১)*।

আহলেহাদীছগণ বিভিন্ন হাদীছের কিতাবে ও বিশ্বস্ত ফিক্বহ গ্রন্থসমূহে ‘আহলুল হাদীছ’, ‘আছহাবুল হাদীছ’, ‘আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত’, ‘আহলুল আছার’, ‘আহলুল হক’ ‘মুহাদ্দেছীন’ প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়েছেন। সালাফে ছালেহীনের অনুসারী হিসাবে তাঁরা ‘সালাফী’ নামেও পরিচিত।[৫০] আহলেহাদীছগণ মিসর, সূদান, শ্রীলংকা প্রভৃতি দেশে ‘আনছারুস সুন্নাহ আল-মুহাম্মাদিয়াহ’, সউদী আরব, কুয়েত প্রভৃতি দেশে ‘সালাফী’, ইন্দোনেশিয়াতে ‘আল-জামা‘আতুল মুহাম্মাদিয়াহ’ এবং পাক-ভারত উপমহাদেশে ‘মুহাম্মাদী’ ও ‘আহলেহাদীছ’ নামে পরিচিত। যদিও বিরোধীরা তাঁদেরকে লা-মাযহাবী, রাফাদানী, ওয়াহ্হাবী, গায়ের মুক্বাল্লিদ ইত্যাদি বাজে নামে অভিহিত করে থাকেন।

দুনিয়ার সকল মুসলমান কি আহলেহাদীছ?

(هل المسلمون كلهم أهل الحديث؟)

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে অস্বীকার কিংবা সম্পূর্ণ অমান্য করে কেউ মুসলমান হ’তে পারে না। তাই এক হিসাবে দুনিয়ার সকল মুসলমানই আহলেহাদীছ। কিন্তু একটু সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, মুসলমানদের মধ্যে এযাবৎ যতগুলো দল, মাযহাব ও তরীকার সৃষ্টি হয়েছে এবং আজও হচ্ছে, তার সবগুলোই কোন না কোন ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। সেজন্য প্রত্যেক মাযহাবের পৃথক পৃথক ‘ফিক্বহ’ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। প্রত্যেক মাযহাবের অনুসারীরা স্ব স্ব ফিক্বহের কিতাবসমূহ হ’তে ফৎওয়া সংগ্রহ করে থাকেন এবং সেগুলোকেই কার্যত অভ্রান্ত শরী‘আত ভেবে মান্য করে থাকেন। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে তার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোন নির্দেশ আছে কি-না, তা খুঁজে দেখার অবকাশ তাদের থাকে না। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের মনে এ অন্ধ

৪৯. আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ, ‘মিনহাজুস সুন্নাহ’ (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইল্‌মিয়াহ, তাবি, ১৩২২ হি. মিসরী ছাপা হ’তে ফটোকপিকৃত) ১/২৫৬ পৃ. ।

৫০. ছাহাবা, তাবেঈন ও হাদীছপন্থী বিগত বিদ্বানগণকে ‘সালাফে ছালেহীন’ বলা হয়। -লেখক

বিশ্বাস বদ্ধমূল থাকে যে, স্বীয় তরীকা বা মাযহাবী ফিক্বহের বিপরীত পবিত্র কুরআন বা ছহীহ হাদীছে কোন কথাই থাকতে পারে না।

সেটাও মন্দের ভাল ছিল যদি না অবস্থা আরও নিম্ন পর্যায়ে নেমে যেত। বর্তমানে কোন কোন আলেম ও পীর যেকোন কারণেই হোক মাঝে-মধ্যে এমনামন অভিনব ফৎওয়া জারি করে থাকেন, যার সাথে কুরআন-হাদীছ তো দূরের কথা, নিজ মাযহাবী ফিক্বহের কিতাবেরও কোন সম্পর্ক নেই। যেমন আমাদের সমাজে প্রচলিত পীরপূজা, কবরপূজা, মীলাদ-ক্বিয়াম, কুলখানী, চেহলাম, হায়াতুন্নবী, আল্লাহ নিরাকার, তিনি সর্বত্র বিরাজমান, যত কল্লা তত আল্লাহ ইত্যাদি কুফরী আক্বীদা ও বিদ‘আতী আমলসমূহের পিছনে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) কিংবা তাঁর মাযহাবের শ্রেষ্ঠ কিতাবসমূহে কোনরূপ সমর্থন নেই। অথচ সরলবুদ্ধি জনসাধারণ অন্ধ বিশ্বাসে তাদের আলেমদের তাবেদারী করতে গিয়ে এগুলিকেই প্রকৃত ইসলামী অনুষ্ঠান বলে ধারণা করে এবং এর বিরোধিতাকে ইসলামের বিরোধিতা বলে মনে করে। এভাবে তারা বিভিন্ন সময় নানাবিধ শিরক ও বিদ‘আতের শিকার হয়ে পড়ে। যার পরিণতি জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নয়।

অথচ ঐ ব্যক্তির সম্মুখে যদি কোন নিরপেক্ষ হকপন্থী আলেম রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*-এর কোন ছহীহ হাদীছ পেশ করে তার ভুল ধরিয়ে দিতে চান, তাহ’লে বেচারা ভীষণ ক্রোধে ফেটে পড়ে এবং শেষ অস্ত্র হিসাবে নিজের বাপ-দাদা হ’তে শুরু করে বিগত যুগের ইমাম ও পীর-আউলিয়াদের নাম নিয়ে যুক্তি দেখিয়ে বলে ‘তাঁরা কি বুঝতেন না?’ যদিও ঐ সকল বিগত ব্যক্তিদের তাক্বওয়া-পরহেযগারী ও কুরআন-হাদীছের পাবন্দী সম্পর্কে তার স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। অথচ ঐ ব্যক্তি একবারও ভাবে না যে, দ্বীন সম্পূর্ণরূপে ‘অহিয়ে এলাহীর’ উপরে নির্ভরশীল। এখানে কোন ব্যক্তির নিজস্ব রায় বা খেয়াল-খুশীর কোন স্থান নেই।

বলা বাহুল্য উপরোক্ত অজুহাতই ছিল সকল যুগের রেওয়াজপন্থীদের মোক্ষম যুক্তি- যা যুগে যুগে সকল নবীকেই শুনানো হয়েছে। এই অন্ধ কুসংস্কারের বিরোধিতা করার কারণেই সমাজের বুকে জেঁকে বসা কায়েমী স্বার্থবাদীরা নবীদেরকে অকথ্য নির্যাতন করেছে, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে জীবন্ত নিক্ষেপ করেছে, সর্বস্বান্ত অবস্থায় দেশ ত্যাগে বাধ্য করেছে। আজও তারা শেষনবী (ছাঃ)-এর সনিষ্ঠ অনুসারীদের উপরে একইভাবে নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে।

তাক্বলীদের পরিণতি (عاقبة التقليد) :

অন্ধ তাক্বলীদ ও রসম পূজার শেষ পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করলেও গা শিউরে ওঠে। একদিকে থাকেন ভ্রান্তির আশংকাযুক্ত অনুসরণীয় ইমাম অথবা পীর-মাশায়েখ। অন্যদিকে থাকেন দোজাহানের অভ্রান্ত ইমাম, ইমামুল মুত্তাক্বীন ও ইমামুল মুরসালীন শেষনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*। একদিকে থাকে ধর্মের নামে প্রচলিত রসম-রেওয়াজ, অন্যদিকে থাকে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পবিত্র হেদায়াতসমূহ। আল্লাহ না করুন এটিই যদি কারো প্রকৃত অবস্থা হয়ে থাকে, তবে কোন্ আকাশ তাকে ছায়া দিবে, কোন্ যমীন তাকে আশ্রয় দিবে, কোন্ নবীর শাফা'আত সে কামনা করবে?

তাক্বলীদের মায়াবন্ধনে পড়ে মানুষ ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কে কত বড় ইমাম বা কে কত বড় দলের অনুসারী, সেটাই এখন প্রধান বিচার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাযহাবী তাক্বলীদের বাড়াবাড়ির পরিণামে হানাফী-শাফেঈ দ্বন্দ্বে ও শী'আ মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে ও আমন্ত্রণে ৬৫৬ হিজরী মোতাবেক ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে তাতার নেতা হালাকু খাঁর আক্রমণে বাগদাদের আব্বাসীয় খেলাফত ধ্বংস হয়েছে। পরবর্তীতে মিসরের বাহরী মামলূক সুলতান রুকনুদ্দীন বায়বারাসের আমলে (৬৫৮-৬৭৬/১২৬০-১২৭৭ খৃ.) মিসরীয় রাজধানীতে সর্বপ্রথম চার মাযহাবের লোকদের জন্য পৃথক পৃথক ক্বাযী নিয়োগ করা হয়, যা ৬৬৪ হিজরী থেকে ইসলাম জগতের সর্বত্র চালু হয়ে যায়... এবং চার মাযহাব বহির্ভূত কোন উক্তি বা সিদ্ধান্ত কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হ'লেও তার অনুসরণ নিষিদ্ধ করা হয়'। বুরজী মামলূক সুলতান ফারজ বিন বারকূক-এর আমলে (৭৯১-৮১৫ হি.) ৮০১ হিজরী সনে মুক্বাল্লিদ আলেম ও জনগণকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে মুসলিম ঐক্যের প্রাণকেন্দ্র কা'বা গৃহের চারপাশে চার মাযহাবের লোকদের জন্য পৃথক পৃথক চার মুছাল্লা কায়েম করা হয়। এভাবে তাক্বলীদের কু-প্রভাবে মুসলিম উম্মাহ্র বিভক্তি স্থায়ী রূপ ধারণ করে। ১৩৪৩ হিজরীতে বর্তমান সঊদী শাসক পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ আব্দুল আযীয আলে-সঊদ (১৮৭৬-১৯৫৩ খৃ.)-এর শুভ উদ্যোগে উক্ত চার মুছাল্লা উৎখাত হয়। ফলে সকল মুসলমান বর্তমানে কুরআন-হাদীছের বিধান অনুযায়ী একই ইবরাহীমী মুছাল্লায় এক ইমামের পিছনে এক সাথে ছালাত আদায় করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে *(থিসিস পৃ. ৮৯)*। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

জাতীয় তথা ধর্মীয় তাক্বলীদের দুনিয়াবী পরিণতি হিসাবে বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকার নামে আমরা দলে দলে বিভক্ত হয়েছি। বিজাতীয় তাক্বলীদের ফলে আমরা প্রগতির নামে ইহূদী-খৃষ্টান ও অমুসলিমদের চালু করা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি কুফরী মতবাদের অন্ধ অনুসারী হয়েছি। ভাষা ও অঞ্চলভিত্তিক জাতীয়তাবাদের পূজা করতে গিয়ে একক 'ইসলামী খেলাফত' ভেঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ৫৭টি দুর্বল মুসলিম রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছি। বহু দলীয় গণতন্ত্রের ধুয়া তুলে একটি দেশকে ভিতর থেকে অনৈক্যে ও বিশৃঙ্খলায় স্থায়ীভাবে ঘুণে ধরা ও দুর্বল করে রাখার অনৈসলামী ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করেছি। সরকারী ও বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক সমাজ ব্যবস্থার বিষবাষ্পে বঙ্গভবন থেকে বস্তিঘর পর্যন্ত হিংসা ও অশান্তির আগুনে জ্বলছি। এভাবে একদিকে আমাদের জাতীয় ঐক্য ছিন্নভিন্ন হয়েছে। অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী ঐক্যবদ্ধ 'ইসলামী খেলাফত' তথা মুসলমানদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি বিধ্বস্ত হয়েছে। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ এখন ইহূদী-খৃষ্টান ও ইসলাম বিরোধী অক্ষশক্তির ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে।

এককালের উমাইয়া খেলাফতের (৪১-১৩২ হি./৬৬১-৭৫০ খৃ.=৯০বৎসর) রাজধানী দামেশ্ক, আব্বাসীয় খেলাফতের (১৩২-৬৫৬ হি./৭৫০-১২৫৮ খৃ.=৫০৯বৎসর) রাজধানী বাগদাদ, স্পেনীয় উমাইয়া খেলাফতের (৯২-৮৯৭ হি./৭১১-১৪৯২ খৃ.=৭৮১বৎসর) রাজধানী গ্রানাডা, তৎকালীন পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র ও 'বিশ্বের বিস্ময়' কর্ডোভা-সেভিল আজ ইতিহাসের বিষয়বস্তু। ভারতবর্ষের মুসলিম শাসনের (৩৫১-১২৭৩ হি./৯৬২-১৮৫৭ খৃ.= ৮৯৫ বৎসর) কেন্দ্রস্থল গযনী (কাবুল) ও দিল্লী আজ ইতিহাসের হারানো অধ্যায়। সর্বশেষ উছমানীয় খেলাফতের (৭০০-১৩৪২ হি./১৩০০-১৯২৪ খৃ.= ৬২৪বৎসর) রাজধানী ইস্তাম্বুল বা কনষ্ট্যান্টিনোপল ও তুরস্ক আজ 'ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তি' বলে ইহূদী-খৃষ্টান জগতের হাসি-ঠাট্টার বস্তুতে পরিণত হয়েছে। ক্রুসেড বিজেতা সেনাপতি ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী (৫৬৪-৫৮৯ হি./১১৬৯-১১৯৩ খৃ.)-এর শাসিত মিসর এখন কথিত ইহূদী রাষ্ট্র (?) ইস্রাঈলের বন্ধু।

শান্তির ধর্ম ইসলামের অনুসারী মুসলমান আজ অশান্তির দাবানলে জ্বলছে। কিন্তু কেন? কে এজন্য দায়ী? ইসলাম না মুসলমান? ঔষধ না রোগী? নিশ্চয়ই দোষ ঔষধের নয়। কেননা এ ঔষধ বহু পরীক্ষিত। তাছাড়া

ইসলামের যথার্থতার প্রশংসায় তো অমুসলিমরাই বেশী সোচ্চার। অতএব সে দোষ নিশ্চয়ই রোগীর, যারা এর ব্যবহার জানে না। আমরা যারা ঔষধ তাকে রেখে কেবল ঔষধ ঔষধ তাসবীহ জপেছি, কিন্তু সেবন করে দেখিনি। অথবা সঠিক ব্যবহারবিধি শিখিনি। কিংবা অল্প শিখে বাকীটা অনুমান করে নিয়েছি কিংবা অন্য কিছু মিশিয়ে মনের মত করে 'মিকশ্চার' বানিয়েছি, সেই আমরাই এজন্য দায়ী।

মুসলমানদের বর্তমান এই করুণ পরিণতি হেদায়াতের মূল উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মহান শিক্ষা হ'তে দূরে থাকারই ফল। আর একারণেই শাশ্বত জীবন বিধান পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের যুগোপযোগী সমাধান পেতে ব্যর্থ হয়ে আধুনিক শিক্ষিত যুবকেরা আজ ক্রমেই বিভিন্ন বস্তুবাদী দর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। ইসলামের মধ্যে বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকার বিভিন্ন চেহারা দেখে তারা মূল ইসলামকেই সন্দেহ করছে। দরগাহ, খানক্বাহ ও হালক্বায়ে যিকরের জৌলুস দেখে অথবা বিলাসী রাজনীতির জাঁকজমকপূর্ণ মঞ্চে ও মিছিলে ইসলামের তেজিয়ান শ্লোগান শুনে তারা ইসলামকে ভুল বুঝছে। তাকে পুঁজিবাদের সমার্থক অথবা শোষণের হাতিয়ার ভাবছে। অথচ মানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*, হযরত আবুবকর, ওমর, ওছমান ও আলী (রাঃ)-এর রেখে যাওয়া ইসলাম কি এই? নিশ্চয়ই নয়। তা পেতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই ছেড়ে দিতে হবে বিজাতীয় মতবাদসমূহ এবং অবশ্যই ফিরে যেতে হবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মূল শিক্ষার মর্মকেন্দ্রে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, আন্তরিকভাবে আমরা তা পেতে চাই কি?

আহলেহাদীছের বৈশিষ্ট্য

(مَيِّزات أهل الحديث)

এবারে 'আহলেহাদীছ' সম্পর্কে চিন্তা করুন। এটি প্রচলিত অর্থে কোন ব্যক্তি ভিত্তিক মাযহাব, মতবাদ বা ইজম-এর নাম নয়। বরং এটি একটি পথের নাম। যে পথ আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র পথ। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথ। এপথের শেষ ঠিকানা হ'ল জান্নাত। মানুষের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক জীবনের সমস্ত হেদায়াত এপথেই মওজুদ রয়েছে। ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম ও সালাফে ছালেহীন সর্বদা এপথেই

মানুষকে আহ্বান জানিয়ে গেছেন। আহলেহাদীছ তাই চরিত্রগত দিক দিয়ে একটি দাওয়াত, একটি 'আন্দোলন' এর নাম। এ আন্দোলন ইসলামের নির্ভেজাল আদিরূপ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। এ আন্দোলন দুনিয়ার সকল মানুষকে বিশেষ করে বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকায় বিভক্ত শতধা বিচ্ছিন্ন মুসলিম উম্মাহকে সকল প্রকারের সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামী ছেড়ে এবং সকল দিক হ'তে মুখ ফিরিয়ে চিরশান্তির গ্যারান্টি আল্লাহ্‌র কিতাব ও শেষনবী মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*-এর সুন্নাতের মর্মকেন্দ্রে জমায়েত হবার আহ্বান জানায়। কিতাব ও সুন্নাতের অভ্রান্ত পথনির্দেশকে কেন্দ্র করেই এ আন্দোলন গতি লাভ করেছে। উম্মতের কোন ফক্বীহ, মুজতাহিদ, অলি-আউলিয়া, ইমাম বা ইসলামী চিন্তাবিদের দেওয়া কোন নিজস্ব চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে এ আন্দোলন গড়ে উঠেনি। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ব্যতীত এ আন্দোলনের কর্মীদের অন্য কোন 'গাইড বুক' নেই। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)* ব্যতীত তাদের অন্য কোন অভ্রান্ত ইমাম নেই। ইসলাম ব্যতীত তাদের অন্য কোন 'মাযহাব' বা চলার পথ নেই। তাদের জন্য নির্দিষ্ট কোন ফিক্বহ গ্রন্থ নেই। প্রচলিত চার মাযহাবের ইমামদেরকে তারা যথাযোগ্য সম্মান করে থাকেন। কোনরূপ অন্ধভক্তি বা অন্ধ বিদ্বেষের বশবর্তী না হয়ে বরং বিভিন্ন মাযহাবের যে সকল সিদ্ধান্ত পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুকূলে হয় বা সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়, তারা বিনা দ্বিধায় তা গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু ভুল ও শুদ্ধ সবকিছু মিলিয়ে কোন একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের অন্ধ অনুসরণ বা তাক্বলীদ করাকে তারা অন্যায় ও অযৌক্তিক বলে মনে করেন।

তাদের মাঝে পুরোহিত তন্ত্রের কোন অবকাশ নেই। নেই পীরের 'ফয়েয' লাভের বা তাদের 'অসীলায়' মুক্তি -পাবার অহেতুক কোন মাথাব্যথা। তাদের রোগমুক্তি অথবা মামলায় ডিগ্রী পাবার জন্য কোন 'পীর বাবা' কিংবা 'সাধু বাবা'-র চরণ ধূলি নিতে হয় না। কোন আউলিয়ার কবরে মানত করতে হয় না। কারো 'মুরীদ' হওয়ার সনদও নিতে হয় না।

খালেছ তাওহীদে বিশ্বাসী আহলেহাদীছগণ দুঃখে ও বিপদে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌রই সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁরই নিকটে আশ্রয় ভিক্ষা করেন। তাঁরই নিকটে কাঁদেন, তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য ছাদাক্বা করেন। 'তাক্বদীরের' ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস রেখে যথাসাধ্য 'তদবীর' করে চলেন। পরকালীন

মুক্তির জন্য তারা শিরক ও বিদ‘আতমুক্ত এবং শরী‘আত অনুমোদিত নেক আমলকেই একমাত্র ‘অসীলা’ মনে করেন, যা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই খালেছ হয়ে থাকে। যে সকল কথায় ও কর্মে শিরক ও বিদ‘আতের সামান্যতম ছিটে–ফোঁটা রয়েছে, তা হ’তে তারা দূরে থাকেন। কোন মানুষকে ‘ইলমে গায়েব’ বা অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী বলে তারা বিশ্বাস করেন না। নবী ব্যতীত অন্য কাউকে তারা মা‘ছূম বা নিষ্পাপ বলে মনে করেন না।

শেষনবী মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*-কে তারা নূরের সৃষ্টি বা ‘নূরনবী’ নয় বরং মাটির সৃষ্টি ‘মানুষ নবী’ বলে মনে করেন। তারা কোন মৃত ব্যক্তিকে নিজের জন্য বা অপরের জন্য কোনরূপ মঙ্গলামঙ্গলের অধিকারী বলে বিশ্বাস করেন না। এমনকি কোন জীবিত ব্যক্তিও আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত অপরের কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না। কবরে সিজদা করা, সেখানে মানত করা, ফুল দেওয়া, বাতি দেওয়া, গেলাফ চড়ানো, গোসল করানো, নযর-নেয়ায পাঠানো, মোরগ বা খাসি যবেহ করে ‘হাজত’ দেওয়া, কবরবাসীর অসীলায় মুক্তি কামনা করা, তার নিকটে ফরিয়াদ পেশ করা ইত্যাদিকে তারা প্রকাশ্য শিরক মনে করেন। এমনিভাবে একই সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের লাখো মীলাদের মাহফিলে রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*-এর রূহ মুবারক হাযির হওয়ার অলীক ধারণা ও তাঁর সম্মানে সকলে দাঁড়িয়ে (ক্বিয়াম করে) সালাম জানানোকে সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টার গুণ কল্পনার মতই ঘৃণ্যতম পাপ বলে মনে করেন। তাঁর নামে ‘জশনে জুলূস’ ও র‍্যালী করাকে স্রেফ ‘রিয়া’ ও ভক্তির নামে ভান করা বলে মনে করেন। যা নিকৃষ্টতম বিদ‘আত সমুহের অন্তর্ভুক্ত। এমনিভাবে কোন মৃত মানুষের সম্মানে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা, নিজেদের বানানো স্মৃতিসৌধে বা শহীদ মিনারে ফুল দেওয়া, মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানো, শিখা অনির্বাণ, শিখা চিরন্তন, বিভিন্ন মানুষের তৈলচিত্র, ছবি, মূর্তি, প্রতিকৃতি ও ভাস্কর্য নির্মাণ ও সেখানে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন ইত্যাদি সবকিছু জাহেলী যুগের ফেলে আসা অগ্নিপূজা ও মূর্তিপূজার জঘন্যতম শিরকী রীতি-নীতির আধুনিক রূপ বলে মনে করেন।

আহলেহাদীছগণ মনে-প্রাণে একথা বিশ্বাস করেন যে, শেষনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)* ইসলামের কোন হুকুম

গোপন করে যাননি। বরং বিশ্ব ইতিহাসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে এবং ইসলামী চরিত্রের নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ রূপকার হিসাবে দীর্ঘ তেইশ বছরের নবুঅতী জীবনে স্বীয় কথায়, কর্মে ও আচরণে ইসলামী শরী'আতের ভিতর-বাহির ও খুঁটি-নাটি সব কিছুই তিনি স্বীয় উম্মতের জন্য স্পষ্ট করে গিয়েছেন এবং 'অহিয়ে এলাহীর' সবটুকু উম্মতের নিকট পূর্ণ সততার সাথে যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। অতঃপর জীবন সায়াহ্নে বিদায় হজ্জে আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত লক্ষাধিক ছাহাবীর নিকট হ'তে সাক্ষ্য নিয়ে আল্লাহ্র নিকট হ'তে সরাসরি ইসলামের পূর্ণাঙ্গতার নিশ্চয়তাও লাভ করেছেন। অতএব আহলেহাদীছগণ মনে করেন যে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে ইসলামী জীবন বিধানের পূর্ণাঙ্গ চিত্র লাভ করার পর নিজেদের আবিষ্কৃত হাক্বীক্বত, তরীক্বত ও মা'রেফাত তত্ত্বের তথাকথিত সীনা ব-সীনা বাত্বেনী ইলমের তালাশে অযথা সময় নষ্ট করা ইসলামের সহজ-সরল ও পরিচ্ছন্ন জীবন বিধান হ'তে দূরে সরে যাওয়ারই নামান্তর। সঙ্গে সঙ্গে এটা শেষনবী *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*-এর শরী'আত সংক্রান্ত আমানতদারীর ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করে, যা ঈমানের প্রকাশ্য বিরোধী।

আহলেহাদীছগণ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*-কে শেষনবী হিসাবে বিশ্বাস করেন এবং এই বিশ্বাসকে ঈমানের অন্যতম প্রধান রুকন বা স্তম্ভ বলে মনে করেন। এই রুকনকে অস্বীকার বা অমান্যকারী কিংবা এতে সন্দেহ পোষণকারী ব্যক্তি কখনোই মুসলমান হ'তে পারে না। তাঁর পরে আর কোন নবী নেই। অতএব তিনি মুসলিম-অমুসলিম, জিন-ইনসান ও সৃষ্টিজগতের একমাত্র নবী। তাঁর অনুসারী বিশ্বের সকল মুসলমান একই মিল্লাতভুক্ত একটি মহাজাতি। যেখানে ফের্কাবন্দীর কোন অবকাশ নেই। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' মুসলিম মিল্লাতকে আপোষে সকল দলাদলি ভুলে শেষনবী মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*-এর একক নেতৃত্বে শুধুমাত্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ মহাজাতিতে পরিণত করতে চায়।

আহলেহাদীছগণ ইসলামের প্রথম চারজন খলীফাকে 'খুলাফায়ে রাশেদীন' (সঠিক পথের অনুসারী খলীফাগণ) বলে বিশ্বাস করেন। তাঁদের সহ রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*-এর অপর যে কোন ছাহাবীর প্রতি সামান্যতম অসম্মান প্রদর্শন করাকে তারা 'গুনাহে কাবীরা' বলে মনে করেন। তারা মহানবী *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*-এর

পরিবারবর্গের প্রতি যেমন মনে-প্রাণে ভক্তি রাখেন, তেমনি মহররমের তা'যিয়ার নামে হুসায়েন-পূজারও চরম বিরোধিতা করে থাকেন।

খালেছ সুন্নাতের অনুসারী আহলেহাদীছগণ কোন অবস্থাতেই বিদ'আতের সাথে আপোষ করেন না। লৌকিকতার নামে, দেশাচারের নামে, বিদ'আতে হাসানাহ্র নামে অথবা 'হিকমতের' দোহাই পেড়ে এরা কোন বিদ'আতকে কখনই প্রশ্রয় দেন না। এদের নিকটে সবচাইতে সম্মানিত ঐ ব্যক্তি, যিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সকল প্রকারের শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে সর্বদা আপোষহীন থাকেন এবং যেকোন মূল্যে তাওহীদ ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ করে চলেন। বিপ্লবী আদর্শ ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে আহলেহাদীছগণ ইসলামকে সর্বযুগীয় সমাধান বলে বিশ্বাস করেন এবং ইসলামের গতিশীল (Dynamic) হওয়ার স্বার্থেই 'ইজতিহাদ'কে সকল যুগে অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং 'তাক্বলীদে শাখছী'কে অবশ্য বর্জনীয় বলে মনে করেন।[৫১] তারা একথাই বলতে চান যে, 'তাক্বলীদে শাখছী' হ'ল মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক অগ্রগতির মূলে সবচাইতে বড় বাধা। কেননা এর ফলে আমরা কেবল একজনের একটি নির্দিষ্ট চিন্তাধারার অন্ধ অনুসরণ করি, যার মধ্যে ভুলের আশংকা পুরা মাত্রায় বিদ্যমান। অথচ উক্ত একই বিষয়ে আরও যে কিছু উন্নত চিন্তা অন্যের মধ্যে কিংবা আমার নিজের মধ্যেই থাকতে পারে, এই চেতনা ও আত্মবিশ্বাস আমরা হারিয়ে ফেলি। তাক্বলীদের সাক্ষাৎ পরিণতিতে অবশেষে আমরা হয়তবা সারাটি জীবন ধরে একজনের দেওয়া একটি ভুলের অনুসরণ করে চলি। অথচ স্ব স্ব ইহকালীন ও পরকালীন স্বার্থেই তা পরিত্যাগ করে নিরপেক্ষভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করে চলা মুক্তিকামী মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য ছিল। বলা আবশ্যক যে, আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূল দাবী চিরদিন এটাই।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় 'আহলেহাদীছ'-এর পরিচয় এবং এ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যাবলী সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সকল আহলেহাদীছ মুসলমান, কিন্তু সকল মুসলমান

৫১. ইজতিহাদ-এর আভিধানিক অর্থ : সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। পারিভাষিক অর্থ : 'কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে ছাহাবার মধ্যে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না এমন বিষয়ে শারঈ বিধান নির্ধারণের জন্য নিয়মানুযায়ী সার্বিক অনুসন্ধান প্রচেষ্টা চালানো। -প্রকাশক।

আহলেহাদীছ নন। কেননা অন্যেরা কেবল ঐ হাদীছগুলিই মানেন, যেগুলি তাদের অনুসরণীয় ইমাম বা আলেমদের গৃহীত মাযহাবের অনুকূলে হয়। কিন্তু আহলেহাদীছগণ নিরপেক্ষভাবে যেকোন ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করে থাকেন। উপরের আলোচনায় একথাও প্রমাণিত হয় যে, আহলেহাদীছ আন্দোলন ও অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হ'ল, 'তাক্বলীদে শাখছী' বা অন্ধ ব্যক্তিপূজা। এই তাক্বলীদ ধর্মীয় ক্ষেত্রে কোন মাযহাব বা তরীকার হৌক কিংবা বৈষয়িক ক্ষেত্রে প্রগতির নামে বিজাতীয় কোন মতবাদের হৌক। 'অহি'র বিধানের আনুগত্য ব্যতীত ধর্মীয় ও বৈষয়িক সকল ক্ষেত্রে সকল প্রকারের তাক্বলীদ বর্জনযোগ্য। অতএব যাবতীয় মাযহাবী সংকীর্ণতা ও তাক্বলীদী গোঁড়ামী ছেড়ে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত মন নিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দেওয়া ফায়ছালার সম্মুখে আনুগত্যের মস্তক অবনতকারী ব্যক্তিই মাত্র 'আহলেহাদীছ'। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মহান ছাহাবী, তাবেঈ ও মুহাদ্দেছীনের উপাধিধন্য এই গৌরবময় নামে নিজেকে পরিচয় দিতেও অনেকে সংকোচ বোধ করে থাকেন।

অনেকে আহলেহাদীছকে হানাফী, শাফেঈ প্রভৃতি তাক্বলীদী ফের্কার প্রতিদ্বন্দ্বী কিংবা অনুরূপ একটি পৃথক ফের্কা বলে মনে করেন। অথচ ঐগুলি নির্দিষ্ট একজন ইমামের অথবা মাযহাবী আলেমদের অনুসারী দল মাত্র। পক্ষান্তরে ঐসব গণ্ডী ভেঙ্গে যারা নিরপেক্ষভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী হন, তারাই কেবল 'আহলেহাদীছ' হ'তে পারেন। কেননা 'আহলেহাদীছ' অর্থাৎ 'হাদীছের অনুসারী' বললে কোন ব্যক্তির অনুসারী বুঝায় না। অতএব রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)* যেমন বিশ্বনবী, তাঁর নিকটে প্রেরিত 'অহি' যেমন বিশ্বমানবতার কল্যাণের জন্য, তেমনি সর্বশেষ 'অহি' ভিত্তিক আন্দোলন তথা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' তেমনি দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণের জন্য নিবেদিত।

পরিশেষে আমরা সবিনয়ে নিবেদন রাখতে চাই যে, যেভাবে নির্দিষ্ট ইমাম, মাযহাব, ফিক্বহ ও তরীকা রচনা করে লোকেরা বিভিন্ন দলীয় নামে বিভক্ত হয়েছেন, এ ধরনের কোন বৈশিষ্ট্য আহলেহাদীছদের মধ্যে কেউ দেখেছেন কি? অতএব ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম ও মুহাদ্দেছীনকে যেমন কেউ কোন ব্যক্তি পূজারী ফের্কায় চিহ্নিত করতে পারেন না, তেমনি তাঁদেরই নামে নামাংকিত ও তাঁদেরই একনিষ্ঠ অনুসারী

আহলেহাদীছগণকেও প্রচলিত অর্থে কোন ফের্কায় চিহ্নিত করা যায় না। তবে উদার ও অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যগত কারণে আহলেহাদীছগণ নিঃসন্দেহে একটি পৃথক জামা'আতী সত্তা। যে বৈশিষ্ট্যের কারণে ছাহাবায়ে কেরামের জামা'আতকেও 'আহলুল হাদীছ' বলা হয়ে থাকে।

ঐক্যের আন্দোলন

(حركة إتحاد الأمة)

এক্ষণে যদি কেউ সত্যিকার অর্থে ইসলামী ঐক্য চান এবং ইসলামের বিধান ও অনুশাসনসমূহ সঠিকভাবে পালন করে ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি কামনা করেন, তবে তাকে সর্বপ্রথম তার গলা থেকে তাক্বলীদের বেড়ী ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে এবং মাযহাবী সংকীর্ণতা পরিহার করতে হবে। কেননা যারা চার মাযহাব মান্য করাকে ফরয (?) বলেন, তাদের মুখে মুসলিম ঐক্যের শ্লোগান শোভা পায় না। অতঃপর সম্পূর্ণ খোলা মনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সনিষ্ঠ অনুসারী হ'তে হবে। তা তার নিজ মাযহাবের, নিজ বংশের বা সমাজের এমনকি নিজ দেশের প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধেও যাক না কেন। এই কঠিন ঝুঁকি নিয়ে 'হক' কবুল করতে পারলেই তবে জান্নাতের আশা করা যায়।

১৯৮০-এর দশকের প্রথম দিকে (الإتحاد مع الإختلاف) 'মতপার্থক্য সহ ঐক্য' নামে একটি নতুন ফর্মুলার কথা শোনা গিয়েছিল। কিন্তু প্রায় দু' দশক (১৯৭৮-৯৮) চেষ্টা করেও তাতে কোন ফলোদয় হয়নি।[৫২] কারণ বৈষয়িক অনৈক্যের চাইতে ধর্মীয় অনৈক্য মানুষের মনে বেশী রেখাপাত করে। আর সেকারণেই শ্রেষ্ঠ ইবাদত 'ছালাতের' শুরুতে জায়নামাযের দো'আ, অতঃপর নাওয়ায়তু আন পড়তে হবে কি-না। তাছাড়া বুকে হাত বাঁধা বা নাভীর নীচে হাত বাঁধা, রুকূতে যাওয়া ও ওঠার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করা বা না করা, ঈদায়নের ছালাতে ৬ তাকবীর না ১২ তাকবীর, তারাবীহ্র ছালাত ৮ রাক'আত না ২০ রাক'আত, জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে কি হবে না, ছালাত শেষে ইমাম-মুক্তাদী দু'হাত উঠিয়ে দলবদ্ধভাবে মুনাজাত (প্রার্থনা) করবে কি করবে না, জুম'আর আযান

---

৫২. অধ্যাপক গোলাম আযম, ইসলামী ঐক্যমঞ্চ চাই (ঢাকা: জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিভাগ, ফেব্রুয়ারী ২০০০) পুস্তক দ্রষ্টব্য।

একটা না দু'টা- ইত্যাকার ধর্মীয় পার্থক্য সমূহ ঘুচানো আজও সম্ভব হয়নি। অথচ এসব ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহজ-সরল ঐক্য ফর্মুলা হ'লঃ ছহীহ হাদীছের প্রকাশ্য অর্থ দ্বারা যেটি প্রমাণিত হবে, সেটি সকলে মেনে নিবেন ও বাকীটা ছেড়ে দিবেন। যদি দু'টিই ছহীহ হাদীছে থাকে, তবে সর্বাধিক ছহীহ আমলটি করবেন অথবা দু'টি আমলই সুযোগমত করবেন। নির্দিষ্ট কোন একটির উপরে গোঁড়ামী করবেন না। বলা বাহুল্য, এধরনের পার্থক্য ফিক্বহের অধিকাংশ বিষয়ে রয়েছে।

অনেকে বলেন, আমাদের মধ্যে আক্বীদায় কোন বিরোধ নেই। যত বিরোধ কেবল শাখা-প্রশাখায়। কথাটি একেবারেই ভিত্তিহীন। বরং আমলের সাথে সাথে আক্বীদার ক্ষেত্রেও রয়েছে দুস্তর পার্থক্য। যেমন কেউ বলছেন, আল্লাহ নিরাকার, তিনি সর্বত্র বিরাজমান। অথচ আল্লাহ্র আকার আছে *(ছোয়াদ ৩৮/৭৫, মায়েদাহ ৫/৬৪ ইত্যাদি)*। কিন্তু তাঁর তুলনীয় কিছু নেই *(শূরা ৪২/১১)*। তিনি সাত আসমানের উপর আরশে সমুন্নীত *(ত্বোয়াহা ২০/৫ ইত্যাদি)*। কিন্তু তাঁর ইল্ম ও কুদরত সর্বত্র বিরাজিত *(তালাক ৬৫/১২, বাক্বারাহ ২/১৪৮ প্রভৃতি)*। কেউ বলছেন 'যত কল্লা তত আল্লাহ'। আমরা সবাই আল্লাহ্র সত্তার অংশ *(নাঊযুবিল্লাহ)*। অথচ বিশুদ্ধ আক্বীদা হ'ল, আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা। বাকী সবই তাঁর সৃষ্টি। স্রষ্টা ও সৃষ্টি কখনই এক নয় *(রা'দ ১৩/১৬, নাহল ১৬/১৭ ইত্যাদি)*। মূলতঃ এগুলি ইরানী ও হিন্দুয়ানী অদ্বৈতবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী দর্শন, যা মা'রেফাতের নামে ছূফীবাদী দর্শন হিসাবে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে।

কেউ বলেন, নবী-রাসূল ও পীর-আউলিয়ারা মরেন না, বরং তাঁরা ভূপৃষ্ঠ হ'তে ভূগর্ভে অর্থাৎ কবরে ইন্তেকাল বা স্থানান্তরিত হন মাত্র। তাঁরা কবরে যিন্দা থাকেন ও ভক্তদের ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখেন। অথচ বিশুদ্ধ আক্বীদা হ'ল, মৃতকে কেউ শুনাতে পারে না *(নমল ২৭/৮০)* এবং মৃতদের সামনে পর্দা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত *(মুমিনূন ২৩/১০০)*। আল্লাহ ব্যতীত কেউ কারু কোন ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না' *(মায়েদাহ ৫/৭৬ ইত্যাদি)*। এমনকি কেউ কেউ 'যিন্দা পীর' নামেও অভিহিত হয়েছেন। অথচ বিশুদ্ধ আক্বীদা হ'ল, আল্লাহ স্বীয় নবীকে বলেন, 'নিশ্চয়ই তুমি মৃত্যুবরণ করবে এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে' *(যুমার ৩৯/৩০)*। চরম অদৃষ্টবাদী একদল লোক বলছেন, 'কিছু হইতে কিছু হয় না, যা কিছু হয় আল্লাহ হইতে হয়' আমরা সবাই পুতুল সদৃশ। অতএব 'যেমনে নাচাও তেমনি নাচি,

Contents

পুতুলের কী দোষ'? এর বিপরীতে আরেকদল বলছেন, অদৃষ্ট বলে কিছু নেই। 'মানুষ নিজেই তার অদৃষ্টের স্রষ্টা'। অথচ বিশুদ্ধ আক্বীদা হ'ল, আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলী সংক্রান্ত আয়াত ও ছহীহ হাদীছ সমূহকে প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করতে হবে এবং সকল বিষয়ে ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম ও মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসরণে ফায়ছালা করতে হবে।

এছাড়াও রয়েছে হাক্বীক্বত, তরীক্বত ও মা'রেফাতের নামে চিশতিয়া, ক্বাদেরিয়া, মুজাদ্দেদিয়া ও নকশবন্দীয়া নামক প্রধান চারটি ছূফীবাদী দল, যাদের উপদলসমূহ মিলে রয়েছে প্রায় দু'শ তরীকা। যাদের পরস্পরে আক্বীদা ও আমলে কোন মিল নেই। মিল নেই এক পীরের সাথে আরেক পীরের ও তাদের মুরীদদের। ১৯৮১ সালে সরকারী হিসাব মতে দেশে ২ লক্ষ ৯৮ হাযার পীর। নিঃসন্দেহে তার সংখ্যা এখন অনেক বেশী এবং যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তাই ১৩ কোটি তাওহীদবাদী মুসলিমের অবস্থা এখন ঘুণে ধরা বাঁশের মত।[৫৩] যাতে কোন শক্তি নেই। আর এর একমাত্র কারণ হ'ল, বিভিন্ন শিরকী আক্বীদা ও বিদ'আতী আমল। যেসবের প্রচলনকারী হ'লেন, প্রথমতঃ দেশের এক শ্রেণীর আলেম, যারা দুনিয়াবী স্বার্থে এগুলির প্রচলন করেন ও লালন করেন। দ্বিতীয়তঃ এক শ্রেণীর সমাজনেতা, যারা এগুলিকে সহযোগিতা করেন ও পাহারা দেন। তৃতীয়তঃ এক শ্রেণীর ধনী লোক, যারা তাদের অঢেল ধন-সম্পদ এসবের পিছনে ব্যয় করেন সহজে জান্নাত পাওয়ার ধোঁকায়। চতুর্থতঃ দেশের সরকার, যারা ধর্মের নামে এগুলিকে নিরাপত্তা দিয়ে থাকেন।

সত্য কথা বলতে কি, এদেশের অধিকাংশ পীর ও ইসলামী নেতা তাওহীদ-এর সঠিক ব্যাখ্যা জানেন না কিংবা সুন্নাত ও বিদ'আতের পার্থক্য বুঝেন না। সেকারণ সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন শিরকী আক্বীদা যেমন তাওহীদের নামে পার পেয়ে যাচ্ছে, তেমনি প্রচলিত বিদ'আতসমূহ 'বিদ'আতে হাসানাহ্'র নামে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশে যেন শিরক ও বিদ'আত বলে কিছুই নেই। যা আছে সবই তাওহীদ, সবই সুন্নাত, সবই ইসলাম। এসবের বিরোধিতাকারী আহলেহাদীছরাই আসলে বেদ্বীন ও লা-মাযহাবী। *হা-শা ওয়া কাল্লা!* অনেকে হিতাকাঙ্খী সেজে বলেন, আপনারা সকলের সাথে মিশে যান। অথচ তারা বুঝেন না যে, হক কখনো বাতিলের

---

৫৩. বর্তমানে প্রায় ১৫ কোটি। -প্রকাশক।

সাথে মিলে যায় না। মুক্তা কখনো লবনের মত পানিতে মিশে যায় না। বরং সর্বদা ভেসে থাকে।

অতএব শিরক ও বিদ‘আত সমূহের ব্যাপারে মৌলিক ঐক্যমতে না এসে কেবলমাত্র ভোটের স্বার্থে সাময়িক ‘ইসলামী ঐক্যজোট’ করলে তা কখনই টেকসই হবে না। বরং স্লাইস্ড পাউরুটির মত স্বার্থদুষ্ট পাতলা পর্দার বাহ্যিক ঐক্য যেকোন সময়ে ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে।

বলা আবশ্যক যে, ইসলামের শত্রুরা রাষ্ট্রীয় আগ্রাসনের চাইতে আক্বীদাগত বা সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকেই সর্বদা অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। দেশের বহু জ্ঞানী-গুণী মুসলিম পণ্ডিত ইতিমধ্যেই তাদের আগ্রাসনের শিকার হয়েছেন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। যারা দেশের প্রচার মাধ্যমসমূহে, শিক্ষা কেন্দ্রে, অর্থনৈতিক উপায়-উপাদানসমূহে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে ও রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন অংশে অনুপ্রবেশ করে তাদের কপট উদ্দেশ্য সাধন করে চলেছেন। ঐক্য প্রয়াসী ইসলামী নেতৃবৃন্দকে তাই মূল আক্বীদাগত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার আহ্বান জানাই।

‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’ ইসলামের মধ্যকার বিচ্ছিন্ন ফের্কা সমূহকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র সর্বোচ্চ অধিকার নিঃশর্তভাবে মেনে নেওয়ার একটিমাত্র শর্তে ঐক্যবদ্ধ মহাজাতিতে পরিণত করতে চায়। মুসলিম জাতির পিতা ইব্রাহীম (আঃ)-কে একাই একটি ‘উম্মত’ হিসাবে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে *(নাহ্ল ১৬/১২০)*। যদিও তাঁর যুগে তিনি কার্যতঃ একাকী ছিলেন এবং তাঁর পিতা ও নিজ গোত্র সহ সে যুগের প্রায় সকল মানুষ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

অতএব আজও যেকোন মূল্যে হক-কে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে এবং মনকে উদার রেখে সকলকে হক-এর দিকে আহ্বান জানাতে হবে। সংখ্যায় কম হৌক বা বেশী হৌক হকপন্থী সেই লোকগুলিই হবেন আল্লাহ্র নিকটে সত্যিকারের ঐক্যবদ্ধ একটি জামা‘আত। ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’ সর্বদা সেদিকেই জগদ্বাসীকে আহ্বান জানায় এবং হকপন্থী সেই জামা‘আতই প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আল্লাহ্ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ– ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের (হকপন্থীদের) সঙ্গে থাক’ *(তওবা ৯/১১৯)*।

নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন

(الحركة الإسلامية الخالصة)

আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র দ্বীনকে আল্লাহ্র যমীনে প্রতিষ্ঠা করার যে আন্দোলন তাকেই সত্যিকারের ইসলামী আন্দোলন বলে। এ আন্দোলনের লক্ষ্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা। এর ভিত্তি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ। এর কাজ হ'ল কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা। বস্তুতঃপক্ষে আহলেহাদীছ আন্দোলন ব্যতীত অন্য কোন ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে বিদ্যমান নেই। আর সেকারণেই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' বিশ্ব ইতিহাসের একমাত্র নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন।

ইসলামী আন্দোলন যুগে যুগে হয়েছে, আজও হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের নামে এযাবত যতগুলো আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে, তার প্রায় সবগুলোই অবশেষে সংকীর্ণ মাযহাবী রূপ ধারণ করেছে এবং তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও শাসন সংবিধানে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসরণের বদলে কোন একটি মাযহাবী মতবাদ চেপে বসেছে। যার পরিণতি অতীব ভয়াবহ হয়েছে। বিগত যুগে আব্বাসীয় খেলাফতকালে খলীফা মামূন, মু'তাছিম ও ওয়াছিক্ব বিল্লাহ (১৯৮-২৩২ হি.) কর্তৃক মু'তাযিলা মতবাদের নির্মম পৃষ্ঠপোষকতা, বর্তমানে ইরানে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী হুকূমত তথা শী'আ হুকূমত এবং পাকিস্তান ও বাংলাদেশে একটি বিশেষ ইসলামী দল কর্তৃক সংখ্যাগরিষ্ঠ মাযহাবী (হানাফী) হুকূমত প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব এরই প্রমাণ বহন করে।[৫৪] যেকোন দলীয় নামের সাথে 'ইসলাম' শব্দটি জুড়ে দিলে তা দ্বারা অবশ্যই কিছু সস্তা জনপ্রিয়তা লাভ করা সম্ভব হয়। কিন্তু নিজেদের দলীয় অনুদারতা ঢাকবার জন্য যেরূপ ঢালাওভাবে সকলে ইসলামকে রক্ষাকবচ হিসাবে ব্যবহার করছেন, তাতে ইসলামী আন্দোলন যেন গোলকধাঁধায় পরিণত হয়েছে। কোন্ ইসলামের দলভুক্ত হ'লে সত্যিকারের ইসলামী জামা'আতভুক্ত হ'লাম, তা বুঝতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়।

---

৫৪. দ্রষ্টব্য: উর্দু সাপ্তাহিক আল-ইসলাম (লাহোর) ১৩ বর্ষ ২৩ সংখ্যা এবং বাংলা সাপ্তাহিক সোনার বাংলা (ঢাকা) ৩১শে জানুয়ারী ১৯৮৬ প্রশ্নোত্তরের আসর; অধ্যাপক গোলাম আযম, প্রশ্নোত্তর (ঢাকা: গ্রন্থমালঞ্চ ১৯৯৮) পৃ. ১৮২।

যে বৈশিষ্ট্যগত কারণে ছাহাবায়ে কেরাম স্বর্ণযুগের শ্রেষ্ঠ মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও নিজেদেরকে 'আহলুল হাদীছ' নামে অভিহিত করতেন, সেই একই কারণে নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের ঝাণ্ডাবাহী আহলেহাদীছগণ সকল প্রকারের রাখ-ঢাক ছেড়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্‌কে স্ব স্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজেদের পরিচালিত আন্দোলকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' বলেছেন। তাতে সস্তা জনপিয়তা (Cheap popularity) অবশ্যই ক্ষুণ্ন হয়েছে। কিন্তু তবুও হককে অগ্রাধিকার দিয়ে সম্পূর্ণ খোলা মনে যিনিই নির্ভেজাল ইসলামের অনুসরণে ব্রতী হবেন, তিনিই এ আন্দোলনে শরীক হ'তে পারবেন।

মোদ্দাকথা কালেমা শাহাদাত পাঠকারী যে কোন মুসলমান, তিনি যতই অনৈসলামী ভাবাপন্ন হৌন না কেন, তাকে যেমন 'কাফের' বলা যায় না, তেমনি ইসলামের নামে পরিচালিত কোন আন্দোলন, তার মধ্যে যতই শিরক ও বিদ'আতের জগাখিচুড়ি থাকুক না কেন, সাধারণভাবে তাকে ইসলামী আন্দোলনই বলতে হয়। কিন্তু 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' বলতে এসব ভেজালের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কেননা ইসলামের নির্ভেজাল আদিরূপ প্রতিষ্ঠা করাই এ মহান আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য। অতএব সঙ্গত কারণেই এ আন্দোলনের কর্মীরা সকল প্রকারের শিরক-বিদ'আত ও অনৈসলামী তৎপরতার বিরুদ্ধে হয়ে থাকেন আপোষহীন সংগ্রামী। তাই 'সকলের মনরক্ষা নীতি' অনুসরণে সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের কোন সুযোগ না থাকার কারণে আহলেহাদীছের সংখ্যা অন্যদের তুলনায় চিরদিনই কম। বরং বলা যেতে পারে যে, সংখ্যায় কম হওয়াটাই এদের গৌরব। কেননা রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)* প্রদত্ত সুসংবাদ কেবলমাত্র ঐ সকল মর্দে মুজাহিদের জন্যই নির্ধারিত, যারা পরিত্যাগকারীদের ও বিরোধিতাকারীদের পরোয়া না করে সর্বদা হক-এর উপর বিজয়ী থাকেন *(মুসলিম হা/১৯২০, ১০৩৭)*। তাছাড়া কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ বান্দার সংখ্যা চিরদিনই কম হয়ে থাকে *(সাবা ৩৪/১৩)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন কেন?

(حركة أهل الحديث لما هي؟)

ইসলামের স্বচ্ছ কিরণমালার উপরে অনৈসলামী চিন্তাধারার কালো মেঘ যুগে যুগে ঘনায়িত হয়েছে। কখনো সে আলো সম্পূর্ণ বাধামুক্ত পরিবেশে মানুষের মাঝে শান্তি ও কল্যাণ বয়ে এনেছে। কখনও বা জাহেলিয়াতের

গাঢ় তমিশ্রায় মেঘে ঢাকা সূর্যের মত তার স্বচ্ছ কিরণ মানুষের নিকট আপন স্বরূপে প্রকাশ পেতে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। বুভুক্ষ মানবতা চিরদিন তা পাবার জন্য আকুলি-বিকুলি করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের। আমরা যারা তার যথাযথ পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়ে 'মুসলিম' হয়ে আল্লাহ্‌র নিকট শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসাবে প্রশংসা কুড়িয়েছিলাম। সাথে সাথে বিশ্বব্যাপী আমাদের উচ্চ সম্মান প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। সেই আমরাই ইসলামের সাথে সবচাইতে বেশী বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। ইসলামের স্বচ্ছ সলিলে ভেজাল মিশ্রিত করেছি। মনের মাধুরী মিশিয়ে তাকে মনের মত করে নিয়েছি। ফলে নিজেরা পেয়ে হারিয়েছি। অন্যকেও দিতে অপারগ হয়েছি।

বলতে কি, ইসলামের প্রথম যুগ হ'তেই তার বিরুদ্ধে ভিতর ও বাহির সকল দিক থেকে হামলা পরিচালিত হয়েছে। বিভিন্ন অনৈসলামী চিন্তাধারা ও বিজাতীয় রসম-রেওয়াজকে ইসলামী লেবাস পরিয়ে মুসলিম সমাজে প্রচার ও প্রসার ঘটাবার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে। যুগে যুগে বহু মুসলমান তার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*-এর পবিত্র যুগে মুনাফিকদের কপট আচরণ ও ছাহাবায়ে কেরামের স্বর্ণযুগে তাদের অপতৎপরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন এলাকার নও-মুসলিমদের দ্বারা আমদানীকৃত শিরকী আক্বীদা ও বিদ'আতী প্রথাসমূহের উদ্ভব আমাদেরকে উক্ত কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

বিদ'আতী দলগুলি থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে গিয়ে নির্ভেজাল ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারী ছাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য হকপন্থী মুসলমানগণ সেই যুগে নিজেদেরকে 'আহলুল হাদীছ' হিসাবে পরিচিত করেছিলেন। তাঁরা মুসলিম সমাজকে যাবতীয় অনৈসলামী দর্শন ও সংস্কৃতি হ'তে বিমুক্ত রাখার জন্য জীবনপাত করে গেছেন। যুগে যুগে তাঁদের নেতৃত্বে বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে। মুসলিম মিল্লাতকে কিতাব ও সুন্নাতের মূল ভিত্তির উপরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য নিজেদের সকল শ্রম নিয়োজিত করেছেন। সত্য কথা বলতে কি, একমাত্র এঁদেরই নিঃস্বার্থ খিদমত ও আন্দোলনের ফলে বিদ'আতপন্থীদের হাতে ইসলাম আজও সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হ'তে পারেনি। এঁদের ঘরে আজও তাওহীদ ও সুন্নাহ স্বরূপে প্রাণবন্ত রয়েছে। ইনশাআল্লাহ ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা :

শেষনবী মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*-এর আগমনকালে পৃথিবীর যে করুণ দশা ছিল, বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি তা থেকে কোন অংশে

কম নয়। সে কারণে পৃথিবীর বর্তমান বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতিতে মানবতা যখন চরমভাবে মার খাচ্ছে, বস্তুবাদী দর্শনসমূহ তাদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কারণে যখন ক্রমেই ব্যর্থ প্রমাণিত হচ্ছে এবং সারা বিশ্ব যখন একটি শান্তিময় আদর্শের সন্ধানে উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছে, সেই মুহূর্তে ইসলামের নির্ভেজাল আদিরূপ সকলের সম্মুখে তুলে ধরার মহান দায়িত্ব পালনের জন্য আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের যোগ্য অনুসারীগণকে তাই আজ তাদের চিরন্তন জিহাদী ঐতিহ্য স্মরণ করে চরম ত্যাগের প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। দেশে ও বিদেশে দাওয়াত ও তাবলীগের জোয়ার বইয়ে দিয়ে মানুষকে মূল ইসলামের মর্মমূলে সংগঠিত করতে হবে।

পরিশেষে আমরা বিশ্বের সকল মুসলমান, বিশেষ করে যুব সমাজকে সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাতলে সমবেত হওয়ার এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী স্ব স্ব ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবন পরিচালনা করার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

আহলেহাদীছ : অন্যদের দৃষ্টিতে
(أهل الحديث فى نظر غير المسلمين)

আহলেহাদীছগণের পরিচয় দিতে গিয়ে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ইংল্যাণ্ডের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির স্বনামধন্য পণ্ডিতগণ বলেন: **AHL-I-HADEETH :** The followers of the prophetic traditions, who profess to hold the same view as the early Ashab-al-hadith or Ahl-al-hadith (as opposed to Ahl-al-ray). They do not hold themselves bound by 'Taqlid'.... But consider themselves free to seek guidance in matters of religious faith and practices from the authentic traditions which together with the Quran are in their view the only worthy guide for the true Muslims.

The Ahle-hadith try to go back to first principles and to restore the original simplicity and purity to faith and practices. Emphasis is accordingly laid in particular on the

Contents

reassertion of 'Tawhid' and the denial of occult powers and knowledge of the hidden things (*Ilm-al-ghayb*) to any of his creatures. This involves a rejection of the miraculous powers of Saints and of the exaggerated veneration paid to them. They also make every effort to eradicate customs either to innovation (bid‘a) or to Hindu or non-Islamic systems.

In all these, their reformist programme bears a striking resemblance to that of the '*Wahhabis*' of Arabia and as a matter of fact their adversaries often nickname them Wahhabies.

অর্থ: ‘আহলেহাদীছ’ বলতে রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*-এর হাদীছের অনুসারী দলকে বুঝায়। যারা প্রাথমিক যুগের আহলুল হাদীছ বা আছহাবে হাদীছের ন্যায় মত পোষণ করে থাকেন (আহলুর রায়-এর বিপরীতে)। যারা তাক্বলীদের বন্ধনকে স্বীকার করেন না...। বরং স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করে থাকেন। যারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছকেই একজন প্রকৃত মুসলিমের জন্য যথার্থ পথপ্রদর্শক বা Worthy guide বলে মনে করেন।

আহলেহাদীছগণ ইসলামের প্রাথমিক যুগের মূলনীতিসমূহের দিকে ফিরে যেতে চান এবং আক্বীদা ও আমলের মৌলিক সরলতা ও স্বচ্ছতাকে পুনরুদ্ধার করার প্রচেষ্টা চালান। তারা বিশেষভাবে তাওহীদকে পুনঃনিশ্চিত করার উপরে জোর দেন এবং কোন সৃষ্টিকে অলৌকিক শক্তি অথবা অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী বলতে অস্বীকার করেন। সে কারণে তারা কোন আউলিয়া বা সাধু ব্যক্তির প্রতি কোনরূপ অতিভক্তি প্রদর্শন করেন না। তারা মুসলিম সমাজে সৃষ্ট কোন বিদ‘আত (ধর্মের নামে সৃষ্ট কোন নতুন প্রথা) কিংবা হিন্দুয়ানী প্রথা বা অন্য যে কোন অনৈসলামী রীত-নীতি সমূলে উচ্ছেদ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন। তাদের এই সংস্কারমূলক কার্যক্রম সমূহ আরবের ওয়াহ্হাবীদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সত্য বলতে কি, তাদের বিরোধীরা এ কারণেই তাদেরকে কখনো কখনো ‘ওয়াহ্হাবী’ বলে দুর্নাম করে থাকে’।[৫৫]

---

৫৫. এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইসলাম, লাইডেন, ব্রীল ১৯৬০, ১/২৫৯ পৃ.।

প্রশ্নোত্তর

(الأسئلة والأجوبة)

প্রশ্ন-১ : ইসলামী আন্দোলন না বলে আহলেহাদীছ আন্দোলন বলার পিছনে যুক্তি কী?

উত্তর : ইসলামী আন্দোলন একটি ব্যাপক অর্থবোধক পরিভাষা। শী‘আ, সুন্নী, শিরকী, বিদ‘আতী সকল মত ও পথের মুসলমান ইসলামী আন্দোলনের নামে যে কোন দলে শরীক হ’তে পারেন। কিন্তু ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’ একটি বিশেষ অর্থবোধক পরিভাষা। যেখানে শিরক ও বিদ‘আত বর্জিত প্রকৃত তাওহীদপন্থী মুসলমানই কেবল অংশগ্রহণ করতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ আহলেহাদীছ আন্দোলনে মানব রচিত মতবাদ সমূহের অনুসারী এবং ইসলামের নামে রায়পন্থী কোন মুসলমানের অংশগ্রহণের সুযোগ নেই। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী ব্যক্তিই কেবল আহলেহাদীছ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে থাকেন। তাই আহলেহাদীছ আন্দোলনকেই প্রকৃত প্রস্তাবে নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন বলে আমরা বিশ্বাস করি।

প্রশ্ন-২ : সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের বিপরীতে আহলেহাদীছ-এর নামে আন্দোলন চালানো বৃহত্তর মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরানোর নামান্তর নয় কি?

উত্তর : দেশে ঐক্যের শ্লোগান আছে। কিন্তু বৃহত্তর মুসলিম ঐক্য বলে বাস্তবে কিছু নেই। এর কারণ যারা ঐক্যের কথা বলেন, তারা বৃহত্তর ঐক্যের কোন গ্রহণযোগ্য ভিত্তি দিতে পারেননি। ফলে ইসলামী আন্দোলনের নামে এবং বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকার নামে দেশে অসংখ্য ইসলামী দলের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে রাজনীতির নামে অসংখ্য দল ও উপদল। অথচ এগুলিকে কেউ ফাটল বলেন না। বরং বহুদলীয় গণতন্ত্রের নামে এগুলির প্রশংসাই করা হয়। ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’ সকল দল ও মতের মুসলমানকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে নিঃশর্তভাবে মেনে চলার একটিমাত্র শর্তে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। তাই আহলেহাদীছ আন্দোলনকেই ‘বৃহত্তর মুসলিম ঐক্যের’ একমাত্র প্লাটফরম বলা যেতে পারে। যেখানে সুস্পষ্টভাবে মুসলিম ঐক্যের একটি সর্বজনগ্রাহ্য ভিত্তি পেশ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয়টি হ'ল এই যে, সংখ্যা কখনই সত্যের মাপকাঠি নয়। মুসলমানকে সংখ্যাপূজারী হ'তে *(আন'আম ৬/১১৬)* এবং জেনে-শুনে হককে বাতিলের সঙ্গে মিশ্রিত করতে *(বাক্বারাহ ২/৪২)* পবিত্র কুরআনে নিষেধ করা হয়েছে। বরং স্যখ্যায় কম-বেশী যাই-ই হৌক, সর্বাবস্থায় হক-এর অনুসারী থাকার জন্য তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে *(নিসা ৪/১৭০ প্রভৃতি)*। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকেই মুসলমানগণ অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র মানদণ্ড বলে বিশ্বাস করেন *(হামীম সাজদাহ ৪১/৪২ প্রভৃতি)*। আহলেহাদীছ আন্দোলন সেই বিশ্বাসকেই বাস্তবায়িত করতে চায় মাত্র। অধিকাংশ লোক চিরকাল হক-এর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে, আজও করবে। তাই বলে কি সংখ্যাগুরুর নিন্দাবাদের ভয়ে সংখ্যালঘু সত্যসেবীগণ হক-এর দাওয়াত পরিত্যাগ করে বাতিলের মিছিলে হারিয়ে যাবেন? অতএব হক-এর স্বার্থে বৃহত্তর ঐক্যের বিষয়টি বিবেচনা করা গেলেও হকপন্থীদের সাথে জামা'আতবদ্ধ থাকার কুরআনী নির্দেশ *(তওবা ৯/১১৯)* সর্বদা মেনে চলতে হবে।

প্রশ্ন-৩ : আহলেহাদীছ আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব কি? যদি না হয়, তাহ'লে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে জীবন গড়ার যে দাবী আহলেহাদীছগণ করে থাকেন, তা কিভাবে বাস্তবায়িত হবে?

উত্তর : কাউকে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদান করা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে *(আলে ইমরান ৩/২৬)*। বিভিন্ন মাযহাব সৃষ্টির পূর্বে পৃথিবীর সকল মুসলিম অঞ্চলে এমনকি ৩৭৫ হিজরী পর্যন্ত ভারতবর্ষের তৎকালীন ইসলামী রাজধানী সিন্ধুর মানছূরাহ্তেও (করাচী) আহলেহাদীছগণ রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। ৮ম ও ৯ম শতাব্দী হিজরীতে আহলেহাদীছগণ দক্ষিণ ভারতের গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের শাসনদণ্ড পরিচালনা করেছেন। পুনরায় যে আল্লাহ তাদের হাতে সে ক্ষমতা দিবেন না, এই নিশ্চয়তা কে দিতে পারে? বরং আমাদের উপরে ফরয হ'ল, শিরক বিমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া *(ক্বাছাছ ২৮/৮৭)*। আর দ্বীনকে বিজয়ী করার দায়িত্ব আল্লাহ্র *(ছফ ৬১/৯)*। অবশ্য দাওয়াত কবুল হ'লে তার বিনিময়ে আল্লাহপাক স্বীয় দ্বীনকে যেকোন সময়ে শাসন ক্ষমতায় বসাবেন বলে ওয়াদা করেছেন *(নূর ২৪/৫৫)*। এমনকি ফাসেকদের মাধ্যমেও তিনি এই দ্বীনকে সাহায্য করে থাকেন *(বুখারী হা/৪২০২-০৩)*।

প্রশ্ন-৪ : রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যতীত ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সেজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করে প্রথমে রাষ্ট্র কায়েম করেন। অতঃপর ইসলাম কায়েম করেন।

উত্তর : কথাটি বাস্তবসম্মত নয়। ইসলাম মানুষের জন্য স্বভাবধর্ম। তা কখনোই রাষ্ট্র ক্ষমতার সঙ্গে শর্তযুক্ত নয়। তবে তা নিঃসন্দেহে সহায়ক শক্তি। মুসলমান সর্বাবস্থায় সে চেষ্টা করে যাবে। তাছাড়া রাসূল (ছাঃ) ছিলেন শেষনবী। তাই তাঁর মাধ্যমে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রতিষ্ঠা আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সেটি প্রত্যেক মুমিনের জন্য ফরয দায়িত্ব নয়। বরং আল্লাহ যখন যে মুমিনকে ক্ষমতায় বসাবেন, তখন তার জন্য এটি প্রধান দায়িত্ব হবে। আর অন্যদের দায়িত্ব হবে সহায়ক পরিবেশ তৈরী করা।

দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যতীত কুরআন-হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়া অসম্ভব, এই ধারণাটাই বা সার্বিকভাবে কতটুকু বাস্তব সম্মত? ইসলামের ফৌজদারী ও অর্থনৈতিক আইনের কতগুলি মৌলিক ধারা যেমন খুনের বদলে ক্বিছাছ, চোরের হাত কাটা, ব্যভিচারীর দণ্ড প্রদান, সূদী লেনদেন সরকারীভাবে বন্ধ করা প্রভৃতি বিষয়গুলি বাস্তবায়নের জন্য অবশ্য রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োজন। যে কোন মুসলিম শাসকই এগুলি করতে বাধ্য। না করলে তিনি এজন্য আল্লাহ্র নিকট দায়ী হবেন। সাধারণ মুসলমানগণ ও ইসলামী সংগঠনসমূহ শাসন কর্তৃপক্ষকে এজন্য পরামর্শ দিবেন ও তাদেরকে সংশোধনের প্রচেষ্টা চালাবেন। সেই সাথে নিজেরা সাধ্যমত পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন যাপন করবেন ও জনমত গড়ে তুলবেন।

সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম। ইসলামী রাষ্ট্র থাক বা না থাক, সংখ্যাগুরু হৌক বা সংখ্যালঘু হৌক সকল অবস্থায় সকল দেশে মুসলমানকে ইসলাম অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হবে। এজন্য বিশ্বব্যাপী সর্বত্র ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যিক পূর্বশর্ত নয় এবং তা কখনো সম্ভবও নয়। আর আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনে বাধ্য করেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*। তাছাড়া 'আখেরাতের গৃহ তো আল্লাহ নির্ধারিত রেখেছেন কেবল তাদের জন্য, যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত নয় এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করে না। আর শুভ পরিণাম তো কেবল মুত্তাক্বীদের জন্য' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৩)*।

তৃতীয়তঃ বাংলাদেশের রাজনীতিতে 'জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস'। পক্ষান্তরে ইসলামী রাজনীতিতে 'আল্লাহ্ই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস'। এখানে 'সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ই চূড়ান্ত'। অথচ ইসলামী রাজনীতিতে 'অহি'-র বিধানই চূড়ান্ত'। দুঃখের বিষয়, এদেশে যারা এমনকি ইসলামের নামে রাজনীতি করেন, তারাও বৃটিশ প্রবর্তিত কুফরী গণতন্ত্রের পূজারী এবং 'অধিকাংশের রায়ই চূড়ান্ত'-এই মতবাদে বিশ্বাসী। আর সে কারণেই তারা সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'দেশে যে মাযহাবের লোকসংখ্যা অধিক সেই মাযহাব অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থা হওয়াটাই স্বাভাবিক'।[৫৬] হক-নাহক কোন ব্যাপার নয়, সংখ্যায় বেশী হ'লেই হ'ল। অথচ আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখলাম ইসলামের নামে অর্জিত সুন্নী প্রধান পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ ও প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান হ'লেন শী'আ এবং আইনমন্ত্রী যাফরুল্লাহ খান হ'লেন অমুসলিম ক্বাদিয়ানী। আল্লাহ্র ইচ্ছা তো এভাবেই কার্যকর হয়।

চতুর্থতঃ আজকাল ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির সঙ্গে জোট করাকে কুরায়েশদের সঙ্গে রাসূল (ছাঃ)-এর 'হোদায়বিয়ার সন্ধি'-র সঙ্গে তুলনা করছেন। এর মাধ্যমে তারা রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছেন মাত্র। কেননা রাসূল (ছাঃ) সেদিন ত্বাগূতী কোন বিধানের সঙ্গে আপোষ করেননি। কেবল নিজের নামের শেষে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি মুছে দিয়ে 'মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ' লিখে সন্ধি করেছিলেন *(মুসলিম হা/১৭৮৪; বুখারী হা/২৭৩১)*। পক্ষান্তরে ইসলামী নেতাগণ সেক্যুলার সরকারের পার্টনার হয়ে অসংখ্য ত্বাগূতী বিধানের সাথে আপোষ করে চলেন।

অতএব প্রচলিত এই শিরকী রাজনীতির সঙ্গে আপোষ করে নয়; বরং কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র পক্ষে জনমত গঠনের মাধ্যমে একে পরিবর্তন করাই হ'ল প্রকৃত অর্থে ইসলামী রাজনীতি।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের কর্মীগণ দু'টি বিষয়কে নিজেদের দায়িত্ব মনে করেন। ১- আল্লাহ্র পথে দাওয়াতের মৌলিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে

---

৫৬. দ্রষ্টব্য: সাপ্তাহিক সোনার বাংলা (ঢাকা) ৩১শে জানুয়ারী ১৯৮৬ প্রশ্নোত্তরের আসর; অধ্যাপক গোলাম আযম, প্রশ্নোত্তর (ঢাকা: গ্রন্থমালঞ্চ ১৯৯৮) পৃ. ১৮২।

ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকটে ওযর পেশ করা। ২- হঠকারী বান্দাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র জন্য দলীল কায়েম করা, যেন 'তারা দাওয়াত পায়নি' বলে আল্লাহ্র সম্মুখে কোনরূপ ওযর পেশ করার সুযোগ না পায়।

আর দু'টি বিষয়কে তারা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র উপরে ছেড়ে দেন। তিনি চাইলে সে দু'টি তাড়াতাড়ি বাস্তবায়িত করবেন, চাইলে দেরীতে করবেন। একটি হ'ল, মানুষের হেদায়াত প্রাপ্ত হওয়া। দ্বিতীয়টি হ'ল, তাঁর প্রেরিত দ্বীনকে পৃথিবীতে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করা। উক্ত দু'টি বিষয় অর্জনের জন্য ইসলাম প্রদত্ত সমাজ বিপ্লবের রাজনৈতিক দর্শন অনুসরণে জনগণের আক্বীদা ও আমলের পরিবর্তন ও সংস্কার সাধনে সদা সচেষ্ট থাকা যরূরী *(নূর ২৪/৫৫-৫৬)*। কারণ সরকার পরিবর্তনের চাইতে নবীগণ সমাজ পরিবর্তনকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। আমরা নবীদের সেই তরীকায় চলতে চাই। আর সমাজ পরিবর্তন ব্যতীত সরকার পরিবর্তন সমাজে কোনরূপ স্থায়ী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয় না। যেমন সক্ষম হয়নি ভারতে প্রায় সাড়ে ছয়শো বছরের মুসলিম শাসন এবং বাংলাদেশে ১৯০ বছরের খৃষ্টান ইংরেজ শাসন। যদিও দুর্বলচেতা কিছু লোক তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে।

প্রশ্ন-৫ : ইসলামী আন্দোলনের নামে যতগুলি দল কাজ করছে, তারা সবাই ঠিক। অতএব যেকোন একটি দলে যোগ দিলেই তো চলে।

উত্তর : আমরা বিশ্বাস করি কোন ব্যাপারে 'ঠিক' একটাই হয়, একাধিক নয়। আমরা বিশ্বাস করি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ফায়ছালাই একমাত্র ঠিক, বাকী সবই বেঠিক। আহলেহাদীছ আন্দোলনের কর্মীদেরকে বিশুদ্ধ ইসলামী আন্দোলন থেকে সরিয়ে ভেজাল আন্দোলনসমূহে নেওয়ার জন্যই বর্তমানে 'এটাও ঠিক ওটাও ঠিক'-এর ধোঁকা সৃষ্টি করা হচ্ছে মাত্র।

প্রশ্ন-৬ : আহলেহাদীছ-এর রাজনৈতিক দর্শন কী?

উত্তর : সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী সৃষ্টিকে পরিচালিত করা।

প্রশ্ন-৭ : প্রচলিত রাজনীতিতে কয়টি শিরক আছে?

উত্তর : দু'টি। (১) জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস এবং (২) অধিকাংশের রায়ই চূড়ান্ত। অথচ ইসলামী রাজনীতিতে আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস *(বাক্বারাহ ২/২০, ১৬৫)* এবং অহি-র বিধানই চূড়ান্ত *(আহযাব ৩৩/৩৬)*। এছাড়া প্রচলিত রাজনীতিতে সকল ধর্ম সমান। অথচ ইসলামী রাজনীতিতে আল্লাহ্র একমাত্র মনোনীত দ্বীন হ'ল ইসলাম *(মায়েদাহ ৫/৩)*।

প্রশ্ন-৮ : আহলেহাদীছ-এর নিকটে দেশে আইন রচনার ভিত্তিসমূহ কী কী?

উত্তর : (১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে আইন রচনার মূল ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা (২) অস্পষ্ট বিষয়গুলিতে পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও ইজমায়ে ছাহাবার আলোকে 'ইজতিহাদ' করা (৩) মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসরণে উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধান করা।

প্রশ্ন-৯ : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা। আক্বীদা ও আমলের সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য।

প্রশ্ন-১০ : আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর কর্মপদ্ধতি কী?

উত্তর : আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর কর্মপদ্ধতি হ'ল দু'টি : (১) আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত এবং (২) আল্লাহ বিরোধী পথে প্রতিরোধ। এই প্রতিরোধ হবে জান, মাল, সময়, শ্রম, কথা, কলম ও সংগঠন তথা সর্বাত্মকভাবে বৈধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে। কোনরূপ বিপর্যয় সৃষ্টির মাধ্যমে নয়। এক কথায় আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর কর্মপদ্ধতি হ'ল দু'টি : দাওয়াত ও জিহাদ।

প্রশ্ন-১১ : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' কেমন সমাজ চায়?

উত্তর : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' চায় এমন একটি ইসলামী সমাজ যেখানে থাকবে না প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ; থাকবে না ইসলামের নামে কোনরূপ মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ।

আল্লাহ পাক সকল মুসলিম ভাই-বোনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

এক নযরে আহলেহাদীছ
(أَهلُ الْحَديثِ فِي لَمْحَةٍ)

১. আহলেহাদীছ কে? (مَن هُمْ أَهلُ الْحَديثِ؟)

যিনি সার্বিক জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী।

(اَلَّذِينَ يَتَّبِعُوْنَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ الصَّحِيحَةَ فِي جَمِيعِ نَوَاحِي الْحَياةِ مِن غَـــيرِ اشْتِرَاطٍ)-

২. আহলেহাদীছ আন্দোলন কী? (حَرَكةُ أَهلِ الْحَديثِ ما هِيَ ؟)

ইহা দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করার জন্য ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম।

(هَذِهِ حَرَكةٌ إِسلامِيَّةٌ خالِصةٌ مِن زَمَنِ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عَنهُم إِلَي يَومِنَـــا هَذَا، الَّتِي تَدعُو النَّاسَ إِلَي الْإِعتِصامِ بِالْكِتابِ وَالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ)-

৩. আহলেহাদীছ আন্দোলন কেন? (حَرَكةُ أَهلِ الْحَديثِ لِمَا هِيَ؟)

নিজেদের রচিত অসংখ্য মাযহাব-মতবাদ, ইযম ও তরীকার বেড়াজালে আবেষ্টিত মানব সমাজকে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রদর্শিত অভ্রান্ত সত্যের পথে পরিচালনার জন্যই আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রয়োজন।

(حَرَكةُ أَهلِ الْحَدِيثِ مُهِمَّةٌ جِدًّا لِهِدايةِ النَّاسِ إِلَي الْكِتابِ وَالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ عَلَي فَهْمِ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَلِإِنْقاذِهِمْ من مَحْبِسِ أهلِ الأهواء مِنَ الْمَذاهِبِ وَالطُّرُقِ وَالْآرَاءِ الْمُحدَثَةِ)-

৪. আমাদের আহ্বান (دَعْوتُنَا)

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি!!

(تَعَالَوا نَبْنِ حَياتَنا عَلي ضُوءِ الكِتابِ وَالسُّـــنَّةِ الصَّحِـــيحَةِ)-

৫. আমরা চাই (رَجاءُنا)

আমরা চাই এমন একটি ইসলামী সমাজ, যেখানে থাকবে না প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ; থাকবে না ইসলামের নামে কোনরূপ মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ।

(نَرْجُو أَنْ نُقِيمَ الْمُجْتمعَ الْإِسلاَمِيَّ الَّذِي لاَ تَلْبِسُ مَعَهُ الْآرَاءُ الْأَجنَبِيَّةُ بِإِسمِ الْعَصْرِيَّةِ وَلاَ يَلْبِسُ مَعَهُ التَّعَصُّبُ الْمَذهَبِيُّ الْمُرَوَّجُ بِإِسمِ الدِّينِ)–

****

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لآ إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب–

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই সমূহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৬ষ্ঠ সংস্করণ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=)। **৩.** আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস)। ২৫০/= **৪.** ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=)। **৫.** ঐ, ইংরেজী (২০০/=)। **৬.** নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১৫০/=)। **৭.** নবীদের কাহিনী-২ (১২৫/=)। **৮.** নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৫৫০/=। **৯.** তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩৭০/=)। **১০.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১১.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **১২.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। **১৩.** তিনটি মতবাদ, ৩য় সংস্করণ (৩০/=)। **১৪.** জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=)। **১৫.** হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **১৬.** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৭.** জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৮.** দিগদর্শন-১ (৮০/=)। **১৯.** দিগদর্শন-২ (১০০/=)। **২০.** দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। **২১.** আরবী ক্বায়েদা (১ম ভাগ) (৩০/=)। **২২.** ঐ, (২য় ভাগ) (৪০/=)। **২৩.** ঐ, (৩য় ভাগ) তাজবীদ শিক্ষা (৪০/=)। **২৪.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ, ৪র্থ প্রকাশ (১০/=)। **২৫.** মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (২০/=)। **২৬.** শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=)। **২৭.** আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, ২য় প্রকাশ (২০/=)। **২৮.** উদাত্ত আহ্বান (১০/=)। **২৯.** নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=)। **৩০.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৫ম সংস্করণ (২৫/=)। **৩১.** তালাক ও তাহলীল, ৩য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩২.** হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=)। **৩৩.** ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **৩৪.** ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩৫.** হিংসা ও অহংকার (৩৫/=)। **৩৬.** বিদ‘আত হ’তে সাবধান, অনুঃ (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=)। **৩৭.** নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনুঃ (আরবী)-শায়খ আলবানী (১৫/=)। **৩৮.** সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনুঃ (আরবী)-আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (৩৫/=)। **৩৯.** জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব (১৫/=)। **৪০.** ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?, ২য় প্রকাশ (১৫/=)। **৪১.** মাল ও মর্যাদার লোভ (১৫/=)। **৪২.** মানবিক মূল্যবোধ, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৪৩.** কুরআন অনুধাবন (২৫/=)। **৪৪.** বায়‘এ মুআজ্জাল (২০/=)। **৪৫.** মৃত্যুকে স্মরণ (৩৫/=)। **৪৬.** সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী (৩০/=)। **৪৭.** আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের আগ্রাসী নীল নকশা, অনুঃ (ইংরেজী) -মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব (৪০/=)। **৪৮.** অছিয়ত নামা, অনুঃ (ফার্সী) -শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) (২৫/=)। **৪৯.** ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, ২য় সংস্করণ (৪৫/=)। **৫০.** তাফসীরুল কুরআন ২৬-২৮ পারা (৩৫০/=)। **৫১.** তাফসীরুল কুরআন ২৯তম পারা (২৫০/=)। **৫২.** এক্সিডেন্ট (২০/=)। **৫৩.** বিবর্তনবাদ (২৫/=)। **৫৪.** ছিয়াম ও ক্বিয়াম (৬৫/=)।

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আক্বীদায়ে মোহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ, ৬ষ্ঠ প্রকাশ (১০/=)। **২.** কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/=)।

লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১. সূদ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১. একটি পত্রের জওয়াব, ৩য় প্রকাশ (১২/=)।

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো‘আ, ৩য় সংস্করণ (৪৫/=)। **২.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=)। **২.** মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=)। **৩.** ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনুঃ (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার

Contents

হাসান (১৮/=)। **৪.** ইসলামী পরিবার গঠনের উপায় (৪০/=)। **৫.** মুমিন কিভাবে দিন-রাত অতিবাহিত করবে (৩৫/=)। **৬.** ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার (২৫/=)। **৭.** আত্মীয়তার সম্পর্ক (২০/=)।

লেখক : শামসুল আলম ১. শিশুর বাংলা শিক্ষা (৪০/=)। ২. শিশুর ইংরেজী (৩০/=)। ৩ শিশুর গণিত (৩০/=)।

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনু: (আরবী) -ড. নাছের বিন সোলায়মান (৩০/=)। **২.** যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=)। **৩.** নেতৃত্বের মোহ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৪.** মুনাফিকী, অনু: - ঐ (২৫/=)। **৫.** প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৬.** আল্লাহ্‌র উপর ভরসা, অনু: - ঐ (৩০/=)। **৭.** ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি, অনু: - ঐ (৫৫/=)। **৮.** ইখলাছ, অনু: -ঐ (২০/=)। **৯.** চার ইমামের আক্বীদা, অনু: (আরবী) -ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়িস (২৫/=)। **১০.** শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা, অনু: (আরবী) - আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (২৫/=)। **১১.** আত্মসমালোচনা (৩০=)। ১২. তাছফিয়াহ ও তারবিয়াহ অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (২০/=)।

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=)। ২. শারঈ ইমারত, অনু: (উর্দূ) ২৫/=। ৩. এক নযরে আহলেহাদীছদের আক্বীদা ও আমল, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (২৫/=)। ৪. ইসলামের দৃষ্টিতে মুনাফাখোরী, মজুদদারী ও পণ্যে ভেজাল (৫০/=)।

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/=)। **২.** আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

লেখিকা : শরীফা খাতুন ১. বর্ষবরণ (১৫/=)।

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)। **২.** যুবকদের কিছু সমস্যা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **৩.** ইসলামে তাক্বলীদের বিধান, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৩০/=)।

অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ১. বিদ'আত ও তার অনিষ্টকারিতা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **২.** জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা, অনু: ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী (৩০/=)।

অনুবাদক : তানযীলুর রহমান ১. আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা, অনু: (উর্দূ) -মাওলানা আবু যায়েদ যমীর (৩০/=)।

অনুবাদক : মীযানুর রহমান ১. হাদীছ শরী'আতের স্বতন্ত্র দলীল অনু : (আরবী) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (৪৫/=)। **আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১.** জাগরণী (২৫/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (৩০/=)। **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৬৫/=)। **৩.** জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৪.** ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৫.** দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৬.** ফৎওয়া সংকলন, মাসিক আত-তাহরীক (১৯তম বর্ষ) ৮০/=। **৭.** ঐ, ১৮তম বর্ষ ৮০/=। **৮.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **৯.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ) (৪৫/=)। **১০.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (তৃতীয় ভাগ) (৪৫/=)। **১১.** সাধারণ জ্ঞান (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **১২.** সাধারণ জ্ঞান (দ্বিতীয় ভাগ) (৩০/=)। **১৩.** সাধারণ জ্ঞান (তৃতীয় ভাগ) (৪০/=)। **১৪.** সাধারণ জ্ঞান (চতুর্থ ভাগ) (৪০/=)। **১৫.** ছালাতের মধ্যে পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। এতদ্ব্যতীত প্রচারপত্র সমূহ এযাবৎ ২১টি।